প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি ডিগ্রির জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভের পাঁচ হাজার শব্দের সারাৎসার

অভিসন্দর্ভের বিষয় :

শচীন দাশের উপন্যাস : বিষয়-ভাবনা ও শিল্পশৈলী

গবেষক

সুদীপ সরকার

Registration No.- R-18RS02120120

Date of registration- 13th February, 2019

গবেষণা নির্দেশক

ড. মফিজ উদ্দিন

অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

6.12.23

DR. MAFIZ UDDIN
Professor
Department of Bengali
Presidency University
Kolkata-700 073

PRESIDENCY UNIVERSITY
KOLKATA

বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৭০০০৭৩

Sudip Sarkar
6/12/23

সূচিপত্র

অধ্যায়সূচি	পৃষ্ঠা সংখ্যা
প্রস্তাবনা :	**১-৪**
প্রথম অধ্যায় : শচীন দাশ : জীবন ও সমকাল	**৪-১০**
প্রথম পরিচ্ছেদ : দেশকাল ও ব্যক্তিজীবন	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সাহিত্যিক প্রেক্ষাপট	
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শচীন দাশের উপন্যাসের বিষয়-বৈচিত্র্য	
দ্বিতীয় অধ্যায় : নদীকেন্দ্রিক চিন্তাচেতনা এবং শচীন দাশের উপন্যাস	**১০-১৩**
প্রথম পরিচ্ছেদ : নদী-প্রকৃতি ও মানব সমাজ	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলা উপন্যাসে নদী	
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নদীকেন্দ্রিক চিন্তাচেতনা এবং শচীন দাশের উপন্যাস	
তৃতীয় অধ্যায় : শচীন দাশের উপন্যাসে সুন্দরবনের জনজীবন	**১৩-১৮**
প্রথম পরিচ্ছেদ : সুন্দরবন পরিচয়	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলা উপন্যাসে সুন্দরবন	
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শচীন দাশের উপন্যাসে সুন্দরবনের জনজীবন	
চতুর্থ অধ্যায় : শচীন দাশের উপন্যাসে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন	**১৮-২১**
প্রথম পরিচ্ছেদ : দেশভাগ, ছিন্নমূল মানুষ ও উদ্বাস্তু আন্দোলন	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন	
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শচীন দাশের উপন্যাসে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন	
পঞ্চম অধ্যায় : শচীন দাশের উপন্যাসের ভাষাশৈলী	**২১-২৪**
প্রথম পরিচ্ছেদ : বর্ণনার ভাষা	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সংলাপের ভাষা	
উপসংহার :	**২৪-২৬**
পরিশিষ্ট :	**২৬**
১. সাক্ষাৎকার : শ্রীমতী উমা দাশ (সাহিত্যিক শচীন দাশের সহধর্মিণী)	
২. জীবনপঞ্জি	
৩. রচনাপঞ্জি	
৪. চিত্রপঞ্জি	
গ্রন্থপঞ্জি :	**২৯-৪০**

প্রস্তাবনা

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলা কথাসাহিত্যের বিকাশ ও বৈচিত্র্যে সত্তর দশক বিভিন্ন দিক থেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৬৭-র নকশালবাড়ি গণ-আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, সমকালীন পশ্চিমবঙ্গের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি—প্রভৃতি সমস্ত কিছুই এই দশককে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। সেই সঙ্গে ছিল আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের অভিঘাত। সমকালের এই দোলাচলতার মাঝেই বাংলা সাহিত্য জগতে উঠে এসেছিল এক তরুণ লেখকগোষ্ঠী। সমকালের গতানুগতিক সাহিত্য ভাবনাকে অতিক্রম করে বিষয় ও আখ্যান নির্মাণের স্বকীয়তায় সত্তরের এই নব্য লেখকরা এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। এ-প্রসঙ্গে সমালোচক পরীক্ষিৎ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—

> ‘সত্তর দশক মুক্তির দশক’ এই আপ্ত বাক্যে বাংলা গল্পের যে আন্দোলন সংঘটিত হল তার নিষ্ফল-চিৎকার চেঁচামেচি ভেদবমি করে হারিয়ে গেল কতকগুলি লিটল ম্যাগাজিনের পাতায়! পণ্য সাহিত্যের মৌসুমী বাজারে আন্দোলন সব ধুলিস্যাৎ হল প্রাতিষ্ঠানিক হাতছানির কাছে। যারা লোভ সম্বরণ করতে পেরেছিলেন তারা পরবর্তীতে শক্ত হাতে কলম ধরে নিজেদের অস্তিত্বকে এখনও টিকিয়ে রাখতে পেরেছেন। ষাটের দশকের হৃত ঐতিহ্য সত্তর দশকের প্রথমভাগে কিছুটা পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করেছিলেন সত্তরের লেখকরা।...সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে যে ক’জন লেখক উঠে এসেছেন তাঁদের কলমে সেই নির্দিষ্ট অঞ্চল, সেখানকার সমস্যা, রাজনৈতিক উত্থান পতন, ভাষা, ভৌগলিক অবস্থান সবকিছুকে ‘ডকুমেন্টারী’ উপস্থাপন যথাযথ-ভাবে বর্ণিত হয়েছে।[১]

সত্তরের গল্পসাহিত্যকে কেন্দ্র করে এই বক্তব্য উত্থাপিত হলেও তৎকালের উপন্যাস সাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। এই দশকের কথাসাহিত্যের গতিপ্রকৃতির আলোচনায় সমালোচক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও সমস্বরে উল্লেখ করেছেন—

> উত্তরকালের লেখকদের একটা বড় অংশ গ্রামজীবনের পটভূমিতে উপন্যাস, ছোটগল্প লিখেছেন। অবজ্ঞাত মানুষদের সাহিত্যে ঠাঁই দিয়েছেন। নাগরিক মধ্যবিত্ত শাসিত সাহিত্য ধারাকে গ্রহণ না করে গ্রামীণ অন্ত্যজ সাহিত্যধারা তৈরি হয়েছে সাধন চট্টোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, অভিজিৎ সেন, নলিনী বেরা, সৈকত রক্ষিত, কানাই কুণ্ডু, শচীন দাশ প্রমুখের লেখায়।[২]

অর্থাৎ উপরের আলোচনা থেকে এটুকু স্পষ্ট যে, বিশ শতকের সত্তর দশকের এক শ্রেণির কথাসাহিত্যিকরা তাঁদের চির-পরিচিত অভিজ্ঞতার জগতকে গল্প-উপন্যাসে প্রকাশ করতে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। নিজেদের চেনা-জানা অঞ্চলে গ্রামীণ ও নিম্নবিত্ত প্রান্তিক

মানুষের যে জীবনধারা প্রবহমান, সেই অঞ্চলভিত্তিক গ্রামজীবনকে সাহিত্যে সুচারুরূপে ফুটিয়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন এই দশকের লেখকগোষ্ঠী। সাতের দশকের এই উদীয়মান লেখকদের কলমে প্রকাশ পেয়েছিল মাটিসম্পৃক্ত জনমানসের ছবি। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যে ফুটে উঠেছিল উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল, নলিনী বেরা, অনিল ঘড়াই ও তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে মেদিনীপুর। একই ভাবে সৈকত রক্ষিত পুরুলিয়া অঞ্চল, আবুল বাশার মুর্শিদাবাদ, আফসার আহমেদ হাওড়ার গ্রাম অঞ্চল, অভিজিৎ সেন মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর, স্বপ্নময় চক্রবর্তী বর্ধমান অঞ্চলকে তাঁদের সাহিত্যে মূর্ত করে তুলেছেন।[৩] মূলত এই সাহিত্য গোষ্ঠীরই এক উল্লেখযোগ্য সদস্য হলেন সাহিত্যিক শচীন দাশ।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ‘কালিকলম’-পত্রিকায় ‘বর্ণপরিচয়’ নামক ছোটগল্পের মধ্যে দিয়ে সাহিত্য জগতে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘কলকাতার দিকে রাস্তা’ প্রকাশিত হয় ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে। ১৩৮৫ বঙ্গাব্দের (১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ) শারদীয়া অমৃত পত্রিকায় প্রকাশ পায় তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘জীবনের একদিক’। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘যুদ্ধ সংকেত’ প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর শেষ উপন্যাস ‘তিস্তার কাছাকাছি’ প্রকাশিত হয় ২০২৪ সালে। ব্যক্তিগত জীবনে সাহিত্যিক শচীন দাশ সহজ সরল, নিষ্ঠাবান ও কর্মোদ্যোগী মানুষ হিসাবেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। গল্প-উপন্যাস রচনার পাশাপাশি লিখেছেন বহু সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনার সঙ্গেও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের জন্মের সার্ধশতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্যোগী হয়েছিল রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশে। সেই সুবৃহৎ কর্মকাণ্ডে চতুর্দশ খণ্ড পর্যন্ত সম্পাদনা সহায়কের কাজে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ জলসম্পদ ভবন থেকে প্রকাশিত ‘সেচপত্র’, দেব সাহিত্য কুটির, প্রমা—প্রভৃতি প্রকাশনার পত্রিকাগুলির উৎকর্ষসাধনে তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

সাহিত্যিক শচীন দাশ ছিলেন বাংলা সাহিত্যের ছাত্র। ফলে উপন্যাস রচনায় নিজের চির-পরিচিত অঞ্চল ও অভিজ্ঞতার প্রকাশে পুনরাবৃত্তি নয়, মূলত পরিপূরকমূলক সাহিত্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তিনি। এক্ষেত্রে তাঁর উপন্যাসগুলির সার্বিক পর্যালোচনা করলে আমরা মূলত তিনটি বিষয়কে প্রধান হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। জন্মের পর থেকেই দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবনের অভিশাপের সাক্ষী থেকেছেন তিনি। দেখেছেন উদ্বাস্তুদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন। ফলত সেই কলোনি জীবনের অভিজ্ঞতা, উদ্বাস্তুদের লড়াই ও স্বাধিকার অর্জনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে তাঁর দেশভাগকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিতে। আবার বাঘাযতীন কলোনি থেকে নিকটবর্তী দক্ষিণের লাট ও বাদা অঞ্চলের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর সুন্দরবন অঞ্চলের জনসমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন।

সেখানকার জনগোষ্ঠীর লোকায়ত বিশ্বাস, ধর্মভাবনা ও প্রাত্যহিক জীবন যন্ত্রণার কথা হয়ে উঠেছিল তাঁর সাহিত্যচর্চার প্রধান অবলম্বন। অন্যদিকে আড়িয়াল খাঁ নদীতীরে ছিল তাদের পূর্বপুরুষের বাসস্থান। কর্মসূত্রে নদীকেন্দ্রিক সুন্দরবন অঞ্চলের সাথে নৈকট্যের কারণে সেই নদী ও নদীকেন্দ্রিক জনসমাজ তাঁর চিন্তাচেতনার জগতকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে। বহু উপন্যাসে তাঁর জীবনাদর্শের প্রতিফলনে এই নদী-ই কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। মিথ-লোককথার প্রয়োগ, পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যের পুনর্নির্মাণের মধ্যে দিয়ে এই ধারার উপন্যাসে তিনি যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন তা সমকালের নিরিখে বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে। সুতরাং তাঁর উপন্যাস-সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে একথা নিঃসন্দেহে উল্লেখ করা যায় যে, বাংলার নদীকেন্দ্রিক জীবনধারার ইতিহাস অন্বেষণে, সুন্দরবনকেন্দ্রিক জনজীবনের ইতিবৃত্ত রচনায় এবং উদ্বাস্তু জীবনের বৃত্তান্ত প্রকাশে শচীন দাশের সাহিত্য প্রতিভা এখনও অনালোচিত থেকে গেছে। বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে তাঁর সাহিত্য প্রতিভার যথার্থ অন্বেষণই আমার এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং এই বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ রেখেই আলোচ্য গবেষণাপত্রের শিরোনাম রাখা হয়েছে ‘শচীন দাশের উপন্যাস : বিষয়-ভাবনা ও শিল্পশৈলী’।

আলোচ্য গবেষণা প্রকল্পটির রূপায়নে সাহিত্যিক শচীন দাশের যে উপন্যাসগুলি গৃহীত হয়েছে, সেগুলি হল ‘জীবনের একদিক’ (১৯৭৮) ‘বাঘের চোখ’ (১৯৮০) ‘যুদ্ধ সংকেত’ (১৯৮৮), ‘আগুনের দিন’ (১৯৯৭), ‘দুই জীবনের গল্প’ (২০০০), ‘অন্ধ নদীর উপাখ্যান’ (২০০৪), ‘উদ্বাস্তু নগরীর চাঁদ’ (২০০৮), ‘নুন সাগরের মানুষজন’ (২০০৮), ‘নদী তরঙ্গের আয়না’ (২০০৯), ‘জল জঙ্গলের রয়ানি’ (২০১৩), ‘বর্ডার’ (২০১০), ‘নুন দরিয়া’ (২০১১), ‘লাশ ভাইস্যা যায়’ (২০১৪), ‘মানচিত্র বদলে যায়’ (২০১৪), ‘আকালুদ্দি ও এক নদী’ (২০১৪), ‘এক পয়সার ট্রাম’ (২০১৬), ‘বৃষ্টির শব্দ’ (২০১৬) ও ‘তিস্তার কাছাকাছি’ (২০২৪)। আলোচ্য উপন্যাসগুলির নির্দিষ্ট বিষয়কেন্দ্রিক আলোচনায় ঔপন্যাসিকের মূল প্রবণতাগুলিকে চিহ্নিতকরণের চেষ্টা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রস্তাবনা ও উপসংহার ব্যতীত প্রধান পাঁচটি অধ্যায়ে শচীন দাশের জীবন ও সমকাল, নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস, সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাস, দেশভাগের নানা প্রভাব এবং উপন্যাস নির্মাণের শিল্পশৈলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে এখানে মূলত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রবর্তিত বানান বিধিকে অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণাপত্রে ব্যবহৃত মানচিত্রগুলি (৭ নং চিত্র বাদে) স্বহস্ত অঙ্কিত প্রতিলিপি এবং উপন্যাসে উল্লিখিত সমকাল, নদ-নদী ও স্থান বিশেষের প্রতিকায়নের উদ্দেশ্যে সেখানে সামান্য কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। মানচিত্রের প্রতিলিপি অঙ্কনে মাইক্রোসফট পেইন্ট, পাওয়ারপয়েন্ট, ফটোশপ প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করেছি এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই সহায়ক উৎসসূত্র উল্লেখ করেছি।

সমগ্র গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ড. মফিজ উদ্দিন স্যারের অবদান সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁর নির্দেশনা ও সহায়তা ছাড়া গবেষণা কর্মটি বাস্তবায়িত হতো না। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সন্দীপ কুমার মণ্ডল স্যারের কাছ থেকেও যে নিরলস সাহায্য আর সমর্থন পেয়েছি তাতে তাঁর প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। সাহিত্যিক শচীন দাশের সহধর্মিণী শ্রীমতী উমা দাশ বহু সময়ে লেখকের দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য রচনাগুলি ব্যবহারের অনুমতি ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। তাঁর প্রতিও সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা রইল। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ, আমার সহাধ্যায়ী বন্ধুবান্ধব—যারা বিভিন্ন সময়ে সুপরামর্শ দিয়ে আমাকে ঋদ্ধ করেছে, তাঁদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরি, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি ও সন্দীপ দত্ত লিটল্ ম্যাগাজিন গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী এই গবেষণাকর্মটি সম্পূর্ণ করতে সহায়ক হয়েছে।

সোনারপুর সুদীপ সরকার
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

প্রথম অধ্যায়

শচীন দাশ : জীবন ও সমকাল

গবেষণাকর্মের প্রথম অধ্যায়টিতে সাহিত্যিক শচীন দাশের ব্যক্তিজীবন, সমাজ-সমকাল ও তাঁর সাহিত্যরচনা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংযোজিত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে অধ্যায়টিকে 'দেশকাল ও ব্যক্তিজীবন', 'সাহিত্যিক প্রেক্ষাপট' এবং 'শচীন দাশের উপন্যাসের বিষয়-ভাবনা'—এই তিনটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে।

'দেশকাল ও ব্যক্তিজীবন' নামক প্রথম পরিচ্ছেদে সাহিত্যিক শচীন দাশের সমকালীন আবহের পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন—'শচীন দাশের জন্মকাল : দেশভাগ ও দেশত্যাগের প্রেক্ষাপটে (১৯৫০)' অংশে স্বাধীনতা-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা ও তাদের পুনর্বাসনকেন্দ্রিক টানাপড়েনের অনুষঙ্গে শচীন দাশের পরিবারের দেশত্যাগ, জবরদখল কলোনিতে বসতি স্থাপন প্রভৃতি প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের দাঙ্গায় তাঁর পূর্বপুরুষেরা পূর্ববঙ্গের মাদারিপুর জেলার বসতবাড়ি থেকে বাস্তুচ্যুত হলে বহু দুঃস্বপ্নময় সময় পেরিয়ে হাজির হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। তারপর শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে বাঘাযতীনে জবরদখল কলোনির একটুকরো জমিতে মাথা গোঁজার আশ্রয় জোটে। সেকালে উদ্বাস্তু কলোনিগুলি গড়ে ওঠার বর্ণনা প্রসঙ্গে হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে তাঁর 'উদ্বাস্তু' গ্রন্থে জানিয়েছেন—

> ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি থেকে জবরদখল কলোনিগুলি ব্যাপকহারে গড়ে উঠতে লাগল। অনেকগুলি পরিবার দলবদ্ধ হয়ে একটি বিশেষ স্থান নির্বাচন করত। তারপর তার সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হতেন। তারপর একদিন আকস্মিকভাবে একযোগে পরিবারগুলি এসে জায়গাটি দখল করে নিত। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পরিবারকে জমি বিলি করা হত। তারাও বাঁশের খুঁটি ও হোগলার বেড়া দিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দখল বজায় রাখার মতো একটা ঘর তুলে নিত।...এইভাবে যাদবপুরের দক্ষিণ অঞ্চলে বাঘা যতীন কলোনি, নেহেরু কলোনি, নেতাজী কলোনি প্রভৃতি গড়ে উঠেছিল।[৪]

দক্ষিণ কলকাতার বাঘাযতীন উদ্বাস্তু কলোনির হোগলার বেড়া ঘেরা ঘরেই ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন কথাসাহিত্যিক শচীন দাশ। 'শৈশবকাল ও উদ্বাস্তু কলোনির জীবন (১৯৫১-৬০)' অংশে পঞ্চাশের দশকের বিভিন্ন ঘটনাবলী বর্ণনার অনুষঙ্গে উদ্বাস্তু কলোনির চার দেওয়ালের মধ্যে অতিবাহিত শচীন দাশের শৈশব-জীবনের বিভিন্ন প্রসঙ্গকে তুলে ধরা হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকেই পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছিল। পঞ্চাশের দশক থেকেই খাদ্যের অভাবে বিক্ষোভ দেখা দিতে শুরু করে, যার চূড়ান্ত রূপ ১৯৫৯ ও ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের খাদ্য আন্দোলন। আবার ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দেই কলকাতায় ব্রিটিশ ট্রাম কোম্পানি এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি করলে তাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় ট্রামভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলন। এর ঠিক এক বছরের মধ্যেই ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষকদের দাবী দাওয়া আদায়ের জন্যে সূত্রপাত ঘটে শিক্ষক আন্দোলনের। ফলে সমকালের সমস্তরকম অসাম্যের বিরুদ্ধে মানুষের অধিকার প্রাপ্তির আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল পঞ্চাশের দশক থেকেই। এই সময়কালেই রাষ্ট্র ও শাসক শ্রেণীর উদাসীনতাকে উপেক্ষা করে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানহীন পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল মানুষেরা গড়ে তুলেছিল উদ্বাস্তু-নগরী। তাদের উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠে একের পর এক উদ্বাস্তু কলোনি। জমি মালিক ও শাসক শ্রেণীর আঁতাতে উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদের সমস্তরকম প্রচেষ্টা থাকলেও UCRC (United Central Refugee Council) ও ডিফেন্স পার্টির সহায়তায় সেদিনের ছিন্নমূল মানুষেরা গড়ে তুলেছিল প্রবল প্রতিরোধ। ১৯৫০ সালে সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক, মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক, সোশালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি প্রভৃতি রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের সংগঠনের প্রতিনিধিরা ১৩ই আগস্ট সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ বা ইউ সি আর সি নামক এক কেন্দ্রীয় পরিষদের জন্ম দেন। এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল উদ্বাস্তুদের জন্য নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণ এবং পশ্চিমবঙ্গে তাদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করা।[৫] ফলে উদ্বাস্তু-সংগঠনগুলির উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল একের পর এক উদ্বাস্তু আন্দোলন। তাদের এই সংগঠিত প্রতিবাদের কারণে পিছু হঠেছিল ক্ষমতা আর আধিপত্যবাদ। পরবর্তীকালে এই

উদ্বাস্তু আন্দোলনের পথ ধরেই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়নের পথ সুগম হয়েছিল। শচীন দাশের শৈশব জীবন অতিবাহিত হয়েছিল দক্ষিণ কলকাতার বাঘাযতীন কলোনিতে। স্থানীয় জমি-মালিকদের অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের এগিয়ে যাওয়ার বৃত্তান্ত, কলোনি-জীবনের তীব্র জীবনসংগ্রামের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে এই পর্বের আলোচনায়।

'কৈশোর ও যৌবনকাল (১৯৬১-৭০)' অংশে ষাটের দশকের প্রেক্ষাপটে শচীন দাশের কিশোর জীবনের কথা প্রকাশ পেয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পঞ্চাশের দশকে শুরু হওয়া প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের ধারা পরবর্তী দশকগুলিতেও অব্যাহত ছিল। ১৯৬০ সালেই শুরু হয়ে গিয়েছিল সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট ও বিক্ষোভ। ১৯৬২ সালে ভারত-চিন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে চীনপন্থী কমিউনিস্ট নেতারা বন্দী হলে শুরু হয় বন্দীমুক্তি আন্দোলন। এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে দেখা দেয় ভাঙন। CPI(Communist Party of India) থেকে বেরিয়ে গড়ে ওঠে স্বতন্ত্র CPI(M)। ১৯৬৭ সাল থেকে বাংলার রাজনীতিতে বড়সড় পরিবর্তন আসতে শুরু করে। কংগ্রেস ছেড়ে অজয় মুখোপাধ্যায় বাংলা কংগ্রেস গঠন করে। ফলে CPI(M) ও বাংলা কংগ্রেস মিলে গঠিত যুক্তফ্রন্ট ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে বাংলার সরকার গঠন করে। যদিও মাঝে দুবার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়ার কারণে তা বেশিকাল স্থায়িত্ব পায়নি। এরই মধ্যে বাংলায় শুরু হয়ে গিয়েছিল নকশাল আন্দোলন। জমিকেন্দ্রিক কৃষক আন্দোলনের অনুষঙ্গে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও পরবর্তীকালে তা সর্বাত্মকভাবে সমাজ আন্দোলনের রূপ পায়। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে নবগঠিত CPI(M) ভেঙে গঠিত হয় CPI(ML)। ওদিকে পূর্ববঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানি সেনাদের অত্যাচারে আবার একদল ছিন্নমূল মানুষের ঢল নামে পশ্চিমবঙ্গের বুকে। এই সময় পর্বে তিনি বিদ্যালয় ও কলেজ জীবনের শিক্ষা সম্পন্ন করেন। বাবার কষ্টার্জিত সামান্য বেতনে প্রবল অনটনকে সঙ্গী করেই পাঁচ ভাই-বোনের সঙ্গে তাঁর বড় হয়ে ওঠা। জীবন যুদ্ধের প্রবল যন্ত্রণাই তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছিল এগিয়ে যাওয়ার। পড়াশোনায় তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বাঘাযতীন কলোনির স্থানীয় স্কুল বাঘাযতীন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৬৫ সালে তিনি কলা বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর ১৯৬৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত দক্ষিণ কলকাতার হেরম্বচন্দ্র কলেজে স্নাতকস্তরে ভর্তি হন। এখান থেকেই ১৯৬৯ সালে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এই সময় থেকেই স্কুলের বাংলার শিক্ষক মিহির মুখোপাধ্যায়ের সূত্রে বাংলা সাহিত্যের প্রতি গভীর টান অনুভব করতে থাকেন। পরবর্তী অংশে সত্তর ও আশির দশকে পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পালাবদলের প্রেক্ষাপট এবং এই সময়পর্বে শচীন দাশের কর্মজীবন, দাম্পত্যজীবন ও সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বের আলোচনা স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়কাল থেকে বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত সময়-পরিমণ্ডলে

শচীন দাশের বেড়ে ওঠা, শিক্ষালাভ, জীবন সংগ্রাম এবং সাহিত্যিক রূপে পরিচিতি লাভের প্রসঙ্গগুলি সমকালের অনুষঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শচীন দাশের সাহিত্যিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। এই পরিচ্ছেদের প্রথম অংশে শচীন দাশের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী অংশে শচীন দাশ সমকালীন বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে একটা প্রাথমিক রূপরেখা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে।

১) সমকাল-পূর্ব উপন্যাস সাহিত্যের প্রেক্ষাপট - বঙ্কিম-রবীন্দ্র পর্ব বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে সাবালকত্ব দান করেছিল সন্দেহ নেই। পরবর্তীতে বঙ্কিমের উপন্যাসের গঠন ও রবীন্দ্রনাথের মনোবিশ্লেষণের রীতির সমন্বয়ে শরৎচন্দ্র উপন্যাস সাহিত্যের গতিপথকে প্রশস্ত করতে সাহায্য করেন। বিদেশি তত্ত্ব ও আদর্শবাদে আকৃষ্ট হয়ে প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্যকুমার-শৈলজানন্দ-প্রবোধকুমারের মতো কল্লোলীয়রা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন ঘটাতে সচেষ্ট হলেও তাঁদের সৃষ্টিতে বাস্তবতা ও দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ছিল যথেষ্ট। সেই প্রয়াস পেরিয়ে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগমন ঘটলে উপন্যাস সাহিত্য নবরূপে সঞ্জীবিত হয়েছে। বিভূতিভূষণ তাঁর বেশিরভাগই উপন্যাসই রাঙিয়ে তুলেছিলেন প্রকৃতি ও নিসর্গ চেতনার গাঢ় রঙে। তারাশঙ্করের সাহিত্যে বীরভূমের অপরিচিত আঞ্চলিক প্রকৃতি আর ব্রাত্য জনসমাজ প্রাধান্য বিস্তার করেছে। সেখানে সমান গুরুত্ব পেয়েছে সামন্ত্রতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার সাথে পুঁজিবাদী ক্ষমতাবাদের দ্বন্দ্ব। মানিকের উপন্যাসে ফ্রয়েড এবং মার্কসের তত্ত্ব প্রাধান্য পেলেও নির্মোহ অন্তর্দৃষ্টি ও বাস্তব সমাজ সচেতন চিন্তাচেতনাই তাঁকে কালোত্তীর্ণ হতে অধিক সহায়তা করেছে।

তিরিশের উপান্তে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত, চল্লিশের দশকের দুর্ভিক্ষ দাঙ্গা দেশভাগ প্রভৃতি দ্বন্দ্বময় সময়ের প্রেক্ষাপটে উপন্যাস রচনায় বনফুল, সতীনাথ ভাদুড়ি, মনোজ বসু, গোপাল হালদার প্রমুখদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দ্বন্দ্বমুখর সময়ের প্রভাবে অবসন্ন বাঙালি মানসের স্বাদ পরিবর্তনে বাংলা উপন্যাসে বিষয়বস্তু পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে একদিকে সমকালের বিপরীতে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটকে ব্যবহার করে অতীতচারী উপন্যাস রচনায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, প্রাণতোষ ঘটক, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ সাহিত্যিকেরা। অন্যদিকে অজ্ঞাত ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে অপরিচিত জনসমাজের ছবি প্রকাশে পরিচিতি লাভ করেন সতীনাথ ভাদুড়ি, মনোজ বসু, সৈয়দ মুজতবা সিরাজ, দেবেশ রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখেরা। আবার দেশভাগ পরবর্তী মধ্যবিত্ত বাঙালির হতাশা, বিচ্ছিন্নতাবোধ ও দুর্দশাকে অবমূল্যায়ন করে উপন্যাস রচনা করেছেন জনপ্রিয়তা অর্জন করেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সমরেশ বসু, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী এবং

সমকালীন বহু ঔপন্যাসিকগণ। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের পরিবর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিত্বের নানা সংকট ও তার বিপন্নতার ছবি উঠে এসেছে এক শ্রেণীর নবীন ঔপন্যাসিকদের কলমে। এই শ্রেণীর ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শংকর, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, সমরেশ মজুমদার, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিদের নাম উল্লেখযোগ্য।

২) সমকালীন উপন্যাস সাহিত্যের প্রেক্ষাপট - সাত ও আটের দশকের প্রেক্ষাপটে মননশীল এক শ্রেণীর কথাসাহিত্যিকদের রচনায় নগরমুখীনতার পরিবর্তে গ্রামীণ জনপদ-জীবন, আধুনিক ও বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে গ্রামের আর্থসামাজিক অবস্থাসমূহের পরিবর্তন তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসূত্রে উঠে আসতে শুরু করে। এই পরিবর্তনের পিছনে তিনটি প্রাসঙ্গিক কারণ হল—

- **নকশাল আন্দোলন** – এই আন্দোলন গ্রাম বাংলার মানুষকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হতে শিখিয়েছিল। ফলে সমকালীন কথাসাহিত্যে গ্রামের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।
- **রাজনৈতিক পটপরিবর্তন** - ১৯৭৭ সালে বাংলায় রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটলে গ্রামকেন্দ্রিক সংস্কারের ধারা গতিপ্রাপ্ত হয়। ভূমিব্যবস্থার সংস্কারসাধন, ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষিজমির বিলিবণ্টন, বর্গাদারী কর্মসূচি, কৃষকদের মধ্যে কৃষিঋণ, গ্রামে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার প্রসার প্রভৃতি বিষয়ের রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ সমাজ স্বাবলম্বী হতে শুরু করে। ফলে গ্রামীণ সমাজের এই ভাঙা গড়া, পরিবর্তন সমকালীন উপন্যাস সাহিত্যের বৃহত্তর ক্যানভাসে ধরা পড়তে শুরু করে।
- **লাতিন আমেরিকার সাহিত্যভাবনা** – সত্তর-আশির দশকের সাহিত্যিকরা ইউরোপীয় সাহিত্যধারার তুলনায় লাতিন আমেরিকার হুয়ান রুলফো, মার্কেজ, বোর্হেস, কার্পেন্তিয়ার প্রভৃতি তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্যিকদের চিন্তা চেতনার দ্বারা অনেক বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ-প্রসঙ্গে সমালোচক প্রসূন ঘোষ উল্লেখ করেছেন—

> আশি নব্বইয়ের দশকের বাঙালি ঔপন্যাসিকরা লাতিন আমেরিকার কুহকী বাস্তবের ধাঁচে বাংলা উপন্যাসকেও পরিবেশন করেছেন। ইয়োরোপের রূপকথা, ইয়োরোপের পুরাণ যদি সত্য হয়, তা নিয়ে যদি গর্ব করা যায়, তবে তাঁদের দেশেরও পুরাণ রূপকথা বা লোকপরম্পরায় বহিত কথাও সমান সত্য, সমান গুরুত্বপূর্ণ—এ কথা মনে করেছেন লাতিন আমেরিকার ঔপন্যাসিকরা। আশির দশকের বাংলার শহর মফস্বলেও লাতিন আমেরিকার উপন্যাস এসে পৌঁছেছে আর দীর্ঘকাল উপনিবেশের যন্ত্রণা ভোগ করা ও উপনিবেশের শাসন মুক্ত একটি দেশের ঔপন্যাসিকের সঙ্গে একই যন্ত্রণার

> শিকার আর-একটি দেশের ঔপন্যাসিকরা মনোগত সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। তাই তাঁদের উপন্যাসেও প্রতিফলিত হয়েছে ম্যাজিক রিয়ালিজম বা কুহকী বাস্তবতা, এদেশের মিথ-লোককথা হয়েছে উপন্যাসের উপাদান।[৬]

শচীন দাশের সমকালের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সাধন চট্টোপাধ্যায় (১৮ জানুয়ারি, ১৯৪৪), অভিজিত সেন (২৮ জানুয়ারি, ১৯৪৫), ভগীরথ মিশ্র (২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭), তপন বন্দ্যোপাধ্যায় (৭ জুন, ১৯৪৭), ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় (২৬ নভেম্বর, ১৯৪৮), আবুল বাশার (১৯৫১), অমর মিত্র (৩০ আগস্ট, ১৯৫১), স্বপ্নময় চক্রবর্তী (২ জানুয়ারি, ১৯৫২), নলিনী বেরা (২০ জুলাই, ১৯৫২), কিন্নর রায় (৬ নভেম্বর, ১৯৫৩), অনিল ঘড়াই (১ নভেম্বর, ১৯৫৭ - ২৩ নভেম্বর, ২০১৪), আফসার আহমেদ (৫ এপ্রিল, ১৯৫৯ – ৪ আগস্ট, ২০১৮), সোহরাব হোসেন (২৫ নভেম্বর, ১৯৬৬ – ২ মার্চ, ২০১৮) প্রমুখ আরও অনেকে।

'শচীন দাশের উপন্যাসের বিষয়-বৈচিত্র্য' নামক তৃতীয় পরিচ্ছেদে শচীন দাশের উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। শচীন দাশের সামগ্রিক উপন্যাস সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করলে আমরা তাঁর লেখক-জীবনের দুটি পর্বকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে পারি। সাহিত্যজগতে তাঁর আবির্ভাব ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে 'কালি ও কলম'-পত্রিকায় প্রকাশিত 'বর্ণ পরিচয়' নামক ছোটগল্পের মাধ্যমে। অন্যদিকে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের 'শারদীয়া অমৃত'-তে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জীবনের একদিক'। এরপর থেকে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি নিরন্তর লিখে গেছেন বহু ছোটগল্প উপন্যাস। তারপর পারিবারিক দুর্ঘটনায় সাহিত্যজগৎ থেকে সাময়িক বিরতি নেন তিনি। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের সময়পর্বে পারিবারিক জীবনে সুস্থিতি এলে তাঁকে প্রায় নতুন করে সাহিত্যের পথ চলা শুরু করতে হয়। ফলে তাঁর সাহিত্য জীবনে সুনির্দিষ্টভাবে একটি পর্বান্তর লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে তাঁর সাহিত্য রচনার প্রথম পর্ব হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। অন্যদিকে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে তাঁর মৃত্যু পূর্ববর্তী সময়কালকে তাঁর সাহিত্য জীবনের দ্বিতীয় পর্ব হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'জীবনের একদিক' 'বাঘের চোখ' এবং 'যুদ্ধসংকেত'। এই তিনটি উপন্যাসের মধ্যে প্রথম উপন্যাসটি নগর কলকাতার পটভূমিকায় লেখা। অন্যদিকে পরবর্তী উপন্যাস দুটির প্রেক্ষাপট গ্রামীণ সুন্দরবন। দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসগুলোর মধ্যে নদীকেন্দ্রিকতা ও উদ্বাস্তু জীবনই প্রধান বিষয়রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর সামগ্রিক উপন্যাস সাহিত্যকে বিষয়প্রকরণের নিরিখে মূলত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

১. নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস : ‘অন্ধ নদীর উপাখ্যান’ (২০০৪), ‘নদী তরঙ্গের আয়না’ (২০০৯), ‘জল জঙ্গলের রয়ানি’ (২০১৩), ‘আকালুদ্দি ও এক নদী’ (২০১৪), ‘তিস্তার কাছাকাছি’ (২০২৪)

২. সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাস : ‘বাঘের চোখ’ (১৯৭৮), ‘যুদ্ধ সংকেত’ (১৯৮৮), ‘দুই জীবনের গল্প’ (২০০০), ‘নদী তরঙ্গের আয়না’ (২০০৯), ‘নুন সাগরের মানুষজন’ (২০০৮), ‘নুন দরিয়া’ (২০১১)

৩. দেশভাগ ও উদ্বাস্তু-সমস্যা কেন্দ্রিক উপন্যাস : ‘আগুনের দিন’ (১৯৯৭), ‘উদ্বাস্তু নগরীর চাঁদ’ (২০০৮), ‘বর্ডার’ (২০১০), ‘এক পয়সার ট্রাম’ (২০১৩), ‘লাশ ভাইস্যা যায়’ (২০১৪), ‘মানচিত্র বদলে যায়’ (২০১৪), ‘পিঞ্জরের পাখিরা’ (২০১৫)

এই তিন শ্রেণির উপন্যাসগুলিকে কেন্দ্র করে পরবর্তী তিনটি অধ্যায় নির্মিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নদীকেন্দ্রিক চিন্তাচেতনা এবং শচীন দাশের উপন্যাস

আলোচ্য অধ্যায়ে শচীন দাশের নদীকেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনার কথা প্রকাশ পেয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে অধ্যায়টিকে তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। ‘নদী-প্রকৃতি ও মানব সমাজ’ নামক প্রথম পরিচ্ছেদে নদীর ইতিহাস, সমাজ-সভ্যতা নির্মাণে নদীর ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নদীকে কেন্দ্র করেই একসময় মানব সভ্যতার সূত্রপাত ঘটেছিল। তাই মানব-সভ্যতার আর্থ-সামাজিক কিংবা সাংস্কৃতিক—তার সমস্তরকম বিকাশে নদী বরাবরই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে। ভারতবর্ষ, বিশেষত আমাদের বাংলাও নদীমাতৃক অঞ্চল। বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি নির্মাণে এই নদীর অবদান অনেক। নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেছেন—

> বাঙলার ইতিহাস রচনা করিয়াছে বাঙলার ছোটবড় অসংখ্য নদনদী। এই নদনদীগুলিই বাঙলার প্রাণ; ইহারাই বাঙলাকে গড়িয়াছে, বাঙলার আকৃতি-প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছে যুগে যুগে, এখনও করিতেছে। এই নদনদীগুলিই বাঙলার আশীর্বাদ; এবং প্রকৃতির তাড়নায়, মানুষের অবহেলায় কখনও কখনও বোধহয় বাঙলার অভিশাপও।[৭]

এই নদীকে কেন্দ্র করেই বাঙলার জনসমাজ ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়েছে, আবার এই নদী-তীরেই ভুলণ্ঠিত হয়েছে তাদের সমস্ত সম্পদ, গর্ব ও গরিমা। ড. অতুল সুরের মতে—

> নদীই বাঙলার ইতিহাসের স্রষ্টা। নদীই বাঙালির চরিত্রকে গঠন করেছে ও তার সমাজ ও ইতিহাসকে বৈচিত্র্যময় করেছে। নদীই বাঙলার ভাগ্যবিধাতা।...নদীই বাঙালীকে প্রাচীন জগতের শ্রেষ্ঠ নাবিকে পরিণত

> করেছিল ও বাঙালী বণিককে সাতসমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে সক্ষম করেছিল। আবার এই নদীই বাঙলার বুকে ডেকে এনেছিল বিদেশী বণিককে, যে বণিক তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তাকে নিঃস্ব করেছিল। নদী যেমন একদিকে বাঙলাকে ঐশ্বর্যশালী করেছিল, আবার অপরপক্ষে তাকে দীনহীন করেও ছেড়ে দিয়েছিল।[৮]

স্বাভাবিকভাবে বাংলার নদ-নদী সমূহের সাথে এখানকার মানুষের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বহুকাল থেকেই বিদ্যমান। তাই বাংলার নদ-নদী সমূহের পাশাপাশি নদীকেন্দ্রিক জনসমাজের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় ‘বাংলা উপন্যাসে নদী’। এই পরিচ্ছেদে বাংলা নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসে সম্পর্কে প্রাথমিক পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের বহু উপন্যাসে নদীর প্রসঙ্গ থাকলেও কিছু কিছু উপন্যাসে নদীই হয়ে উঠেছে প্রধান অবলম্বন, কেন্দ্রীয় বিষয়। নদীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে উপন্যাসের নিয়তি ও পরিণতি। নদীকেন্দ্রিক এই শ্রেণীর উপন্যাসে মূলত নদী ও মানুষের নিবিড়-আত্মিক সম্পর্কের কথা প্রকাশ পেয়েছে। নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস সাহিত্যের আলোচনায় ইন্দ্রাণী ঘোষাল লিখেছেন—

> কোথাও নদী সমাজের একটি বিশেষ শ্রমজীবী শ্রেণির মরণ-বাঁচন। নদীকে অবলম্বন করেই এদের জীবনের আবর্তন, বাঁচার লড়াই। আবার কোথাও নদী কাহিনীর এক বা একাধিক চরিত্র বিকাশে সাহায্য করেছে, চরিত্রের আনন্দ বেদনার সঙ্গে একাত্ম হয়েছে। কোথাও নদী কাহিনীর প্রেক্ষাপট রচনা করেছে, কোথাও সামাজিক পটপরিবর্তনে সাক্ষী থেকেছে।[৯]

সুতরাং উপরের বক্তব্যের অনুসরণে আমরা মূলত তিনটি ধারায় নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলির শ্রেণীকরণ করতে পারি। নদীনির্ভর উপন্যাসগুলির এই শ্রেণীকরণের একটিতে নদী অবস্থান করেছে মূলত পটভূমি রূপে। এখানে নদী ও মানুষের সহাবস্থান হয়ে উঠেছে প্রধান। এই শ্রেণির উপন্যাসগুলির মধ্যে সরোজকুমার রায়চৌধুরীর ‘ময়ূরাক্ষী’, সুবোধ বসুর ‘পদ্মা প্রমত্তা নদী’, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়য়ের ‘উপনিবেশ’, কমলকুমার মজুমদারের ‘অন্তর্জলী যাত্রা’, মনোজ বসুর ‘জল জঙ্গল’, হুমায়ূন কবীরের ‘নদী ও নারী’ (১৯৫২), নলিনী বেরার ‘সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় ধারার উপন্যাসগুলিতে নদীকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকা নদীজীবী জনগোষ্ঠীর কথা প্রাধান্য পেয়েছে। তাদের জীবনজীবিকার সংকট ও প্রাত্যহিক জীবনসংগ্রাম এই শ্রেণীর উপন্যাসের মূল উপজীব্য হয়ে উঠেছে। নদী এক্ষেত্রে জনসমাজের নিয়ন্তাস্বরূপ। এই শ্রেণির উপন্যাসগুলির মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি (১৯৩৬), অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ (১৯৫৬), সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’ (১৯৫৭), আব্দুল জব্বারের ‘ইলিশ মারির চর’

(১৯৬১), অমরেন্দ্র ঘোষের ‘চরকাশেম’ (১৯৫০), সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘গহীন গাঙ’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সবশেষে তৃতীয় ধারার উপন্যাসগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছে নদীকেন্দ্রিক কালচেতনার ইতিহাস। এখানে কাল ও ইতিহাসের সূত্রে নদীর অস্তিত্বরক্ষার তাগিদ ও পরিবেশবাদী ভাবনা মুখ্য হয়ে উঠতে দেখা যায়। এই শ্রেণির উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ইছামতী’ (১৯৫০), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ (১৯৬৮), শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘গঙ্গা একটি নদীর নাম’, দেবেশ রায়ের ‘তিস্তা পারের বৃত্তান্ত’, অভিজিৎ সেনের ‘নিম্নগতির নদী’, অমর মিত্রের ‘সোনাই একটি নদীর নাম’ প্রভৃতি। শচীন দাশের উপন্যাসগুলি মূলত তৃতীয় ধারার উপন্যাস, যেখানে ইতিহাসচেতনা ও কালচেতনার পাশাপাশি পরিবেশবাদী ভাবনা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম ‘শচীন দাশের উপন্যাসে নদীকেন্দ্রিক চিন্তাচেতনা’। শচীন দাশের নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস ‘অন্ধ নদীর উপাখ্যান’ (২০০৪), ‘নদী তরঙ্গের আয়না’ (২০০৯), ‘জল জঙ্গলের রয়ানি’ (২০১৩), ‘আকালুদ্দি ও এক নদী’ (২০১৪), ‘যুদ্ধ সংকেত’ (১৯৮৮) প্রভৃতি উপন্যাসগুলি নদী ও তার তীরবর্তী জনমানসের সমাজ সংস্কৃতিকে তুলে ধরার পাশাপাশি নদীর ইতিহাসের পুনরুদ্ধার, তার ঐতিহ্যের অন্বেষণ-প্রভৃতি দিকগুলি সম্পর্কে গভীর ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরিবেশবিষয়ক সাহিত্যভাবনার নিরিখেও আলোচ্য উপন্যাসগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। শচীন দাশের ‘অন্ধ নদীর উপাখ্যান’ (২০০৪) উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে উনিশ শতকের দক্ষিণ প্রবাহিণী আদিগঙ্গার প্রভাবপুষ্ট বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক আবহ। নদীকেন্দ্রিক একটি জনসমাজের লোকায়ত বিশ্বাস-সংস্কার, আর্থ-সামজিক জীবনধারা এখানে বাস্তবনিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। মিথ ও লোককথার সার্থক প্রয়োগে উপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে গাজী মোবারক শাহ, দক্ষিণরায়ের প্রসঙ্গ। এ উপন্যাস এক অর্থে আদিগঙ্গার তীরবর্তী জনসমাজের জীবন্ত ইতিহাস। ‘নদী তরঙ্গের আয়না’ (২০০৯) উপন্যাসে মজে যাওয়া নদীকে কেন্দ্র করে ধনপতির স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার শৈল্পিক নবরুপায়ন ঘটেছে। সুন্দরবনের ধনপতি নদীবানে বাস্তুচ্যুত হলেও নদীকে ভুলতে পারে না। মরা নদীখাতে এক নদীকে খুঁজতে খুঁজতেই সাক্ষাৎ পায় মঙ্গলকাব্যের সপ্তগ্রামের সরস্বতীর। মজে যাওয়া নদীর উৎসসন্ধানের অনুষঙ্গে লোকপুরাণ, রূপকথা ও মিথের প্রয়োগে ঔপন্যাসিক নির্মাণ করতে চেয়েছেন আলোচ্য উপন্যাসের অবয়ব। এই উপন্যাস প্রকৃতপক্ষে শুধু হারিয়ে যাওয়া নদীর কথা বলেনা, নদীর কারণে সর্বহারা মানুষ, সেই নদীকেন্দ্রিক মানবসমাজের ইতিহাস এবং তাঁর সংকটকেও মূর্ত করে তোলে। সমালোচক অরুণকুমার বসুর মতে—

> এ শুধুই গল্প-উপন্যাস নয়, এ হল একটি ইতিহাসের অঙ্গ। সাল-তারিখে, ঘটনার বিশ্বস্ততায় গড়ে তোলা ইতিহাস নয়। এ হল প্রাকৃতিক পরিবর্তনের

ইতিহাস। নদী সরে যাওয়ার, মজে যাওয়ার সঙ্গে জনজীবন কেমন মজে যায়, বদলে যায়—এ তারই ইতিহাস।

বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রনে এক মিথ ভেঙে নতুন এক মিথের বিনির্মাণ করা হয়েছে এ উপন্যাসে। তাতে কখনও উঠে এসেছে সুন্দরবনের উচ্ছেদ হওয়া মানুষ, কখনও আবার সপ্তগ্রামের পাশে, গাঙ্গুরের ধারে মঙ্গলকাব্যের সেইসব মানুষেরা। উঠতে চেয়েছে, উঠে আসতে চেয়েছে। বাধা কেবল হারিয়ে যাওয়া এক নদী। যেন সেই নদীকে পুনরাবিষ্কার করলেই অতীত ও বর্তমান নতুন কোন চেহারায় ধরা পড়বে। ধনপতি খোঁজে তাই সেই নদীকে।[১০]

এইভাবে 'নদী তরঙ্গের আয়না'য় প্রতিফলিত হয় এক বৈশ্বিক নদীচেতনা, মজে যাওয়া নদীর প্রেক্ষাপটে নদীকেন্দ্রিক মানুষের অস্তিত্বের চিরকালীন সংকট আর বিপন্নতা। 'জল জঙ্গলের রয়ানি' (২০১৩) উপন্যাসে সুন্দরবনের প্রেক্ষাপটে নদীকেন্দ্রিক জনসমাজের একটি সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে বসতি স্থাপনকে কেন্দ্র করে লাটদার-জোতদার-জমিদারদের হাতে নিম্নবিত্ত সমাজের শোষণের বৃত্তান্ত, কৃষক সমাজের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কাহিনী, তেভাগা আন্দোলন–প্রভৃতি ইতিহাস চেতনার প্রসঙ্গ উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে। নদীকেন্দ্রিক লোকসমাজের ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতির পাশাপাশি জাদুবাস্তবতার প্রয়োগ নবনী ও তাদের জনগোষ্ঠীর জীবনজীবিকার সমস্যা-সংকট ও দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক। 'আকালুদ্দি ও এক নদী' (২০১৪) উপন্যাসে আকালুদ্দির অনুভবে নদী এক স্বতন্ত্র সত্তা রূপে ধরা দিয়েছে। নদীকে কেন্দ্র করে তার চিন্তাধারায় অন্বিত হয়ে রয়েছে ঔপন্যাসিকের নদীচেতনা।

তৃতীয় অধ্যায়
শচীন দাশের উপন্যাসে সুন্দরবনের জনজীবন

তৃতীয় অধ্যায়ে শচীন দাশের উপন্যাসে উঠে আসা সুন্দরবনের জনসমাজ ও তাদের সংস্কৃতির ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে মূল আলোচনার পূর্বে সুন্দরবনের পরিচয়, অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের রচনায় সুন্দরবন প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদ 'সুন্দরবন পরিচয়' অংশে সুন্দরবনের ভৌগলিক অবস্থান, ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত, নামকরণ প্রসঙ্গ, জীববৈচিত্র্য, নদনদী, জনসমাজ গড়ে ওঠার ইতিহাস ইত্যাদি দিকগুলির আলোচনা রয়েছে। এরই সঙ্গে সেখানকার লোকায়ত সংস্কার ও ধর্মাচরণ, দেবদেবী, জীবনজীবিকা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত আলোচনার দ্বারা সুন্দরবনের একটি সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা হয়েছে। যেমন—

ভৌগোলিক অবস্থান - গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় নদীবিধৌত পলিমাটিতে গঠিত পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবনের অবস্থান। সামগ্রিক সুন্দরবনের আয়তন প্রায় ২৫,৫০০ বর্গকিলোমিটার। দেশভাগের কারণে এর দুই-তৃতীয়াংশ বাংলাদেশের মধ্যে পড়েছে। ফলে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের খুলনা-বাগেরহাট-সাতক্ষীরা অংশে প্রায় ১৫,৮৭০ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃতি পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে স্বাধীন ভারতের চব্বিশ পরগনা অংশে ৯,৬৩০ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়। ভারতের সুন্দরবন অঞ্চলের সীমানা বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে এর পূর্বে রয়েছে রায়মঙ্গল, কালিন্দী ও ইচ্ছামতী নদী, পশ্চিমে হুগলী নদী (প্রাচীন নাম সরস্বতী), উত্তরে ডাম্পিয়ার-হজেস লাইন[১১] এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত - ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এই অঞ্চলে জঙ্গল কেটে জমি ইজারা দেওয়ার কাজ শুরু হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয়, যে ইংরেজ আগমনের পূর্বে সুন্দরবন চিরকালই ঘন বনাঞ্চলে পরিপূর্ণ ছিল। বরং ইংরেজ আমলের বহু পূর্বে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক থেকে শুরু করে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে চব্বিশ পরগণা জেলার নিম্নভূমি অর্থাৎ সুন্দরবন অঞ্চলে যে উন্নত জনপদ গড়ে উঠেছিল, তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। নীহাররঞ্জন রায় সুন্দরবন অংশের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করছেন—

> সবচেয়ে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটিয়াছে বর্তমানে সুন্দরবন অঞ্চলে, চব্বিশ পরগণা- খুলনা-বাখরগঞ্জের নিম্নভূমিতে; এবং সমস্ত পরিবর্তনটাই ঘটিয়াছে মধ্যযুগে। কারণ এই অঞ্চলের পশ্চিম দিকটায় অর্থাৎ চব্বিশ পরগণা জেলার নিম্নাঞ্চলে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সমানে সমৃদ্ধ-ঘনবসতিপূর্ণ জনপদের চিহ্ন প্রায়ই আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। জয়নগর থানার কাশীপুর গ্রামের সূর্যমূর্তি (আনুমানিক ষষ্ঠ শতক); ডায়মন্ডহারবারের প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বকুলতলা গ্রামে প্রাপ্ত লক্ষণ সেনের পট্টোলী (দ্বাদশ শতক); এবং ১৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে মলয় নামক স্থানে প্রাপ্ত জয়নগরের তাম্র-পট্টোলী (সপ্তম শতক) ; রাক্ষসখালি দ্বীপে প্রাপ্ত ডোম্মন পালের পট্টোলী (দ্বাদশ শতক); ওই দ্বীপেই প্রাপ্ত লিপিউৎকীর্ণ এক-ঝাঁক মাটির শীলমোহর (একাদশ শতক); খাঁড়ি পরগনায় প্রাপ্ত অসংখ্য পাথরের মূর্তি, ২/৪ টি ভগ্ন মন্দির, কালীঘাটে প্রাপ্ত গুপ্তমুদ্রা, ইত্যাদি সমস্তই চব্বিশ পরগনা জেলার নিম্নভূমিতে প্রাচীন বাংলার এক বা একাধিক সমৃদ্ধ জনপদের ইঙ্গিত করে।[১২]

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়কালে আগত গ্রিকদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণীতে উল্লেখ ছিল যে এই অঞ্চলে গঙ্গারিডি নামক সভ্যতা বা রাজ্য গড়ে উঠেছিল। সুশীল ভট্টাচার্যের মতে—

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতক থেকে খৃষ্টীয় ২য় শতক-এই ছয় শত বৎসরকাল ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যস্থ সুন্দরবন সল সুবৃহৎ গাঙ্গেয় বদ্বীপে এক বীর বাঙ্গালী জাতির বাস ছিল যাদের নাম গঙ্গারিডি জাতি এবং যাদের রাজধানী ছিল গঙ্গা মোহনার কাছে গঙ্গে নামক সুবিখ্যাত বন্দরে—যে বন্দরের অবস্থান ছিল সম্ভবত সাগর দ্বীপে।[১৩]

নামকরণ প্রসঙ্গ - প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগের আগে পর্যন্ত বিভিন্ন কাব্য-পুরাণ, শিলালিপি, মুদ্রা প্রভৃতিতে সুন্দরবনের উল্লেখ মিললেও তার সামগ্রিক স্বরূপ যথাযথ ভাবে কোথাও উঠে আসেনি। কোথাও বা পাতাল কিংবা রসাতল, কখনও 'ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। মধ্যযুগের সময়পর্বে এসে আমরা প্রথম এই অঞ্চলের প্রাসঙ্গিক একটি নাম পাচ্ছি, সেটি হল 'ভাটি'। এ.এফ.এম. আব্দুল জলিলের 'সুন্দরবনের ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে—

এতদঞ্চল নদীমাতৃক দেশ। এখানকার জলবায়ু আর্দ্র। সেইজন্য সমুদ্রকূলবর্তী দক্ষিণ প্রদেশকে মধ্যযুগের ঐতিহাসিকেরা ভাটী দেশ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং মুঘল যুগের বারভুঞাদিগের নামানুসারে এই দেশের নাম হইয়াছিল- "বারভাটী বাংলা"।[১৪]

এছাড়া সমুদ্র অর্থাৎ বদর থেকে 'বাদাবন' শব্দটিও বহুল ব্যবহৃত। তবে সুন্দরবন নামের উৎস হিসাবে সুন্দরী বৃক্ষের নাম, সমুদ্র শব্দের অপভ্রংশ সমুন্দুর থেকে সমুদ্রবন, সুন্ধা নদী, ইংরাজি শব্দ sundry, চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের চন্দ্রবন, চণ্ডভন্ড জাতি- প্রভৃতি প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

নদনদী- সুন্দরবনের নদ-নদীসমূহের মধ্যে দক্ষিণ প্রবাহিণী আদিগঙ্গা, বিদ্যাধরী, ইছামতী এবং মধ্যভাগে মাতলা, সপ্তমুখী, গোসাবা, ঠাকুরান, হারিয়াভাঙ্গা প্রভৃতি মোহনা নদীর প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে আলোচিত হয়েছে।

দেবদেবী ও ধর্মাচরণ - লৌকিক দেবদেবী হিসাবে বনবিবি, দক্ষিণরায়, বড় খাঁ গাজী, কালু রায় প্রভৃতিদের প্রসঙ্গ ও জনসমাজে তাদের প্রভাবের বিষয়টি এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

জনপদ-জীবন - **১৯** টি ব্লক ও **১৫** টি থানায় বিভক্ত এই অঞ্চলটির মোট দ্বীপের সংখ্যা ১০২। এর মধ্যে ৫৪ টি দ্বীপে জনবসতি রয়েছে, যাদের মধ্যে নিম্নবর্গীয় তপসিলি জাতি ও উপজাতি, ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মীয় মানুষের সংখ্যাই অধিক।

'বাংলা উপন্যাসে সুন্দরবন' নামক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শচীন দাশ পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের রচনায় সুন্দরবন কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তার একটি প্রাথমিক আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বাংলা গল্প-উপন্যাস লেখালিখি শুরু হয়ে গিয়েছিল স্বাধীনতা-পূর্ব সময়কাল থেকেই। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'ব্যাঘ্রাধিকার', রাজশেখর বসুর 'দক্ষিণরায়', ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ডমরুচরিত', কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের

‘কপালকুণ্ডলা’- প্রভৃতি রচনায় সুন্দরবন অঞ্চলের ছোঁয়া লক্ষ করা গেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ‘হলুদ নদী সমুজ বন’-এর মতো উপন্যাস। তবে স্বাধীনতা পরবর্তীকালের রচনায় সুন্দরবন বৃহত্তররূপে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। এই অঞ্চলে গড়ে ওঠা স্বতন্ত্র সমাজ ও সংস্কৃতি, তাদের বিশ্বাস ও রীতি-নীতি অন্বিত জীবন এই পর্বের ঔপন্যাসিকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।

মনোজ বসুর 'জলজঙ্গল' (১৯৫২) ও 'বনকেটে বসত' (১৯৬১) উপন্যাসে মধুসূদন, উমেশ, দুর্লভ, এলোকেশী, কিংবা জগন্নাথ, রাধেশ্যাম, বলাই প্রভৃতিদের সূত্রে উঠে এসেছে আবাদ অঞ্চলের অপরিচিত জগত। শিবশংকর মিত্র তাঁর ‘সুন্দরবন সমগ্র’- গ্রন্থে সংকলিত ‘সুন্দরবনে আজান সর্দার’ (১৯৫৫), 'বনবিবি' (১৯৬৬), 'বাউলে-বেদে' (১৯৮৫) প্রভৃতি উপন্যাসে সুন্দরবনের মানুষদের জীবনযন্ত্রণার আখ্যানকে জীবন্ত করে তুলেছেন। বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বনবিবির উপাখ্যান' (১৯৭৮), 'সন্ন্যাসী বাওয়ালি' (১৯৮১), 'বাগদা' (১৯৮৯) প্রভৃতি উপন্যাসে ধরা পড়েছে সুন্দরবনের বাস্তবনিষ্ঠ নিবিড় জীবন চিত্র। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে একাধিক উপন্যাস রচনা করলেও তাঁর 'নদী মাটি অরণ্য' [প্রথম পর্ব (আদি কাণ্ড – জমিন হাসিল পর্ব) ১৯৯৮, দ্বিতীয় পর্ব (পত্তন পর্ব – মন্থন কাণ্ড, অগ্নিপরীক্ষা কাণ্ড, অজ্ঞাতবাস কাণ্ড, যযাতি কাণ্ড) ১৯৯৯, তৃতীয় পর্ব (তেভাগা পর্ব - অহল্যা কাণ্ড, লঙ্কা কাণ্ড) ২০০১] উপন্যাসে ১৮৫০ থেকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ—এই দীর্ঘ একশো বছরের লোকায়ত সুন্দরবনের জীবনচর্যার ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। সাধন চট্টোপাধ্যায় 'গহীন গাঙ' (১৯৮০) উপন্যাসে জল ও জঙ্গলের প্রেক্ষাপটে সুন্দরবনের লোকজ সমাজের কঠোর জীবনসংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন। অমর মিত্রের ‘ধনপতির চর’ উপন্যাসে প্রতিকায়িত হয়েছে এই অঞ্চলের মানুষদের জীবন যাপনের অসহায়তা। অন্যদিকে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘বন্দর’ (১৯৯২), ‘স্বজনভূমি’(১৯৯৪), ‘চরপূর্ণিমা’ (১৯৯৫) কিংবা ‘সমুদ্রদুয়ার’ (২০১০) প্রভৃতি উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন সমুদ্রতীরবর্তী সুন্দরবন অঞ্চলের সমাজ ও সংকটের ইতিহাসকে। বহু সমালোচক এই অঞ্চলের সাহিত্যকে আঞ্চলিক সাহিত্যের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হলেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাস সাহিত্য আজ বিশ্বসাহিত্যের দরবারে পরিচিতি লাভ করেছে।

‘শচীন দাশের উপন্যাসে সুন্দরবনের জনজীবন’ নামক তৃতীয় পরিচ্ছেদে শচীন দাশের সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি বিশ্লেষিত হয়েছে। শচীন দাশ তাঁর আঞ্চলিক সাহিত্যের পটভূমি হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন মূলত সুন্দরবনকেই। এ বিষয়ে বিশিষ্ট সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী লিখেছেন—

> আঞ্চলিক সাহিত্যের নতুন দিগন্তের বিস্তার ঘটেছে সত্তর-পরবর্তী কথাসাহিত্যিকদের কলমে। কল্পনায় দেখা এবং উপভোগ করা নদী-পাহাড়-

অরণ্যের এবং তথাকথিত সরল গ্রামবাসীদের নিয়ে স্বপ্নচারী লেখা নয়। প্রকৃত বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোন একটি অঞ্চলের সমগ্র সত্যকে নিখুঁতভাবে মূর্ত করে তোলে। শচীন দাশ প্রধানত বেছে নিয়েছেন সুন্দরবন অঞ্চলটি। কর্মসূত্রে এই অঞ্চলের নদী আর অরণ্য, জনজীবন আর বাঁচবার সংগ্রামকে চিনেছেন গভীরভাবে। ভালোবেসেছেন এই বিচিত্র প্রাকৃতিক সম্পদের দেশ আর অভাবতাড়িত মানুষগুলিকে।[১৫]

শচীন দাশের আত্মকথাতেও প্রতিফলিত হয়েছে এই অঞ্চলের প্রতি তাঁর অকৃত্তিম ভালবাসার প্রসঙ্গ—

একদিন ওই কাজ করতে গিয়েই আমাদের বলা হল দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার উনিশটি ব্লকের ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজে কে কে যেতে চায়? এককথায় রাজি হয়ে গেলাম। ব্যস, আর আমাকে কে পায়? ঘোরা শুধু ঘোরা। কখনও লঞ্চে, কখনও ভুটভুটিতে, কখনও বা পায়ে হেঁটে, বাঁধের ওপর দিয়ে সুন্দরবনের মানুষজন যেন তখন এক স্বপ্নের মতো আমার ওই জলযাত্রায় উঠে এলো।[১৬]

সুতরাং এই পর্বের আলোচনায় তাঁর উপন্যাসে সুন্দরবনের সমাজ, সেখানকার জনসমাজের জীবন ও জীবিকা, লোকায়ত সংস্কার, ধর্ম, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রভৃতি বিষয় কীভাবে উঠে এসেছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শচীন দাশের লেখা সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাস 'নুন দরিয়া' প্রকাশিত হয় ২০১১ সালে। এটি সুন্দরবন অঞ্চলের গোড়াপত্তনের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে রচিত। এন্ড্রু ফ্রেজার (Lieutenant Governor of Bengal, 1903-1908) সাহেবের জঙ্গলাকীর্ণ নারায়ণতলা[১৭] (অধুনা ফ্রেজারগঞ্জ) দ্বীপকে আবাদি করতে জমি হাসিলের কাজে আসা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলের নিম্নবিত্ত মানুষদের যে অকথ্য অত্যাচার ও বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছিল, এ উপন্যাস তারই জবানবন্দী। সুন্দরবনের ভূমিহীন মানুষদের প্রথম গণবিদ্রোহের প্রসঙ্গও উপন্যাসসূত্রে আলোচিত হয়েছে। তাঁর 'যুদ্ধ সংকেত' (১৯৮৮) উপন্যাসে সুন্দরবনের নামখানা ও তার পার্শ্ববর্তী লালপুল-ডায়মন্ডহারবার-রত্নেশরপুর-নারায়নপুর-হটুগঞ্জ-কুলপি-কাকদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চল উপন্যাসের মূল পটভূমি হিসাবে উঠে এসেছে। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্প, যেমন—IRDP (Integrated Rural Development Programme), SEP (Self-employment Programme) প্রভৃতি প্রকাশ পেলে সেগুলির বাস্তবায়নে ব্যাঙ্কগুলির সীমাবদ্ধতা, গ্রামীণ রাজনীতি ও ব্যাঙ্ক দুর্নীতির প্রসঙ্গ, স্থানীয় জনসমাজের জীবন-জীবিকার সংকট প্রভৃতি বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হয়েছে নামখানা ব্রাঞ্চের ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কর্মী ঋদ্ধি সেনের অভিজ্ঞতাসূত্রে। 'জল জঙ্গলের রয়ানি' (২০১৩) সুন্দরবনের জল-জঙ্গল অন্বিত লোকায়ত

জনসমাজের আখ্যান। নামখানা-কাকদ্বীপ অঞ্চলের জগদ্দল নদী ও তার তীরবর্তী মানুষের প্রতিনিয়ত জীবনসংগ্রাম, সাধ আর সাধ্যের মধ্যেকার প্রাত্যহিক দ্বন্দ্বকে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন অনবদ্যভাবে। সুন্দরবনের আবাদ পতনের ইতিহাস, জমিদার-জোতদারদের অন্যায়, অত্যাচার ও শোষণ, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের প্রেক্ষাপটে ভাটিদেশের গণবিদ্রোহ তেভাগা আন্দোলন প্রভৃতি বিষয় ইতিহাসের প্রেক্ষিতে আলোচিত হয়েছে। 'অন্ধ নদীর উপাখ্যান' (২০০৪) উপন্যাসে নদী কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করলেও নদীকেন্দ্রিক জনজীবন ও তাদের লোকায়ত ধর্ম, বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্যে দিয়ে আসলে সুন্দরবনকেন্দ্রিক লোকজীবনের কথা প্রকাশ পেয়েছে। আদিগঙ্গা ও টালিমালা, বিদ্যাধরী নদী, মাতলা প্রভৃতি নদী, ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়, গাজী মোবারক শাহ প্রভৃতি লোকদেবতা উপকাহিনীগুলির অনুষঙ্গে মিথ ও লোককথার প্রসঙ্গগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এছাড়াও 'দুই জীবনের গল্প', ও 'নদী তরঙ্গের আয়না' উপন্যাসে ব্যবহৃত সুন্দরবন অঞ্চলের প্রসঙ্গগুলিও আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

শচীন দাশের উপন্যাসে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন

চতুর্থ অধ্যায়ে শচীন দাশের উপন্যাসে দেশভাগকে কেন্দ্র করে উদ্বাস্তু জীবনের নানা সমস্যা ও সংকটের দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে 'দেশভাগ, ছিন্নমূল মানুষ ও উদ্বাস্তু আন্দোলন', 'বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন', 'শচীন দাশের উপন্যাসে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন'—এই তিনটি পরিচ্ছেদে সমগ্র অধ্যায়টি আলোচিত হয়েছে।

'দেশভাগ, ছিন্নমূল মানুষ ও উদ্বাস্তু আন্দোলন' শীর্ষক প্রথম পরিচ্ছেদে দেশ বিভাগের প্রেক্ষাপট ও তার পূর্বাপর সময় প্রবাহের বিভিন্ন ঘটনার বিশ্লেষণ রয়েছে। এদেশে হিন্দু ও মুসলিম সমাজের দীর্ঘকালীন পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহাবস্থান সত্ত্বেও বিংশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে রাজনীতি ও ধর্মের মিশেলে তাদের সম্পর্কের অভিমুখ বদলে যেতে শুরু করে।[১৮] ধর্মের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র দেশের দাবি উঠলেও দাঙ্গা ও দেশভাগের পিছনে রাজনীতির পাশাপাশি একাধিক আর্থ-সামাজিক কারণসমূহও ক্রিয়াশীল ছিল।[১৯] সেক্ষেত্রে বর্ণমুসলিম ও বর্ণহিন্দু শ্রেণীর পারস্পরিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক কারণে বর্ণহিন্দুর সাথে নিম্নবিত্ত হিন্দু ও মুসলিম শ্রেণীর দুরত্ব প্রভৃতি বিষয়সমূহের প্রতি দিকপাত করা হয়েছে। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কার্যাবলী, যা দাঙ্গা ও দেশভাগের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল, তার প্রাসঙ্গিক বর্ণনা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ, তেভাগার কৃষক আন্দোলন প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা হিন্দু-মুসলিম সমাজের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাঁধন কীভাবে আলগা হয়ে গেল, তা বোঝার জন্য চল্লিশের দশকের

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ(১৯৩৯) ও ব্রিটিশদের আর্থিক বিপর্যয়, মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব(১৯৪০), ভারত ছাড় আন্দোলন(১৯৪২), প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মন্বন্তর(১৯৪৩), সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা(১৯৪৬), দেশভাগ এবং স্বাধীনতা—প্রভৃতি বিষয় গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষিত হয়েছে। দেশভাগের কারণে উদ্ভূত উদ্বাস্তুরা মূলত বেশ কয়েকটি পর্বে দেশত্যাগে বাধ্য হয়। এই দেশত্যাগী মানুষদের আর্থ-সামাজিক সংকট, খাদ্য-বাসস্থানের অভাব, মূল্যবোধের অবক্ষয়, নারীজাতির দুরবস্থা, পুনর্বাসন সমস্যা প্রভৃতির পাশাপাশি ভোটাধিকার প্রাপ্তির ফলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির পালাবদলে তাদের ভূমিকার প্রসঙ্গগুলিও এখানে উত্থাপিত হয়েছে।

'বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন' শীর্ষক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবনকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসের একটি প্রাথমিক আলোচনা স্থান পেয়েছে। যেমন—অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড় শ্রীখণ্ড'(১৯৫৭) উপন্যাসে চারটি সমান্তরাল কাহিনীবৃত্তে তিনটি পৃথক শ্রেণীচরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে দেশভাগ পরবর্তী সময়ের অভিঘাত, সমাজের ভাঙাগড়া ও পরিবর্তনের ছবি প্রকাশ পেয়েছে। জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'(১৯৬৭) উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে দেশভাগের প্রেক্ষিতে নারীসমাজের চরম বেদনা ও লাঞ্ছনার ইতিবৃত্ত। এছাড়াও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'(১৯৭১), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব পশ্চিম'(১৯৮৮), প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকা', হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি'(২০০৬) প্রভৃতি উপন্যাসেও দেশভাগের অভিঘাতের বর্ণনা পাই। দেশভাগ ও দেশত্যাগের ফলে উদ্বাস্তুদের দুরবস্থার চালচিত্র অঙ্কিত হয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সার্বজনীন'(১৯৫২), অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'নির্বাস'(১৯৬০), নারায়ণ স্যান্যালের 'বকুলতলা পি এল ক্যাম্প'(১৯৫৫), প্রবোধ কুমার স্যান্যালের 'হাসুবানু' (১৯৫২) প্রভৃতি উপন্যাসে। অমর মিত্রের 'কুমারী মেঘের দেশ চাই'(২০১৭) উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে ছিটমহল সমস্যার ইতিবৃত্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় শচীন দাশের উপন্যাসে প্রকাশিত দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবনের প্রসঙ্গ। শচীন দাশের উপন্যাসগুলিতে দেশভাগের তুলনায় দেশত্যাগ ও উদ্বাস্তু জীবনের বর্ণনা অধিক স্থান পেয়েছে। অসহায় নিপীড়িত পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের দুঃখ দুর্দশা, বিষাদ-যন্ত্রণা যেন ভাস্বর হয়ে উঠেছে তার 'আগুনের দিন' (১৯৯৭),'উদ্বাস্তু নগরীর চাঁদ'(২০০৮), 'বর্ডার'(২০১০), 'লাশ ভাইস্যা যায়'(২০১৮) ''মানচিত্র বদলে যায়'(২০১৪), 'এক পয়সার ট্রাম'(২০১৬) প্রভৃতি উপন্যাসে। 'উদ্বাস্তু নগরীর চাঁদ এবং 'মানচিত্র বদলে যায়'—পরিপূরক এই উপন্যাসগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু পরিবারের জীবনসংগ্রামের ইতিবৃত্ত। উনিশ-শ পঞ্চাশ থেকে এই উপন্যাসের সূত্রপাত। দেশভাগের অভিঘাতে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের অভাব, তৎকালীন প্রশাসন কর্তৃক উদবাস্তু পুনর্বাসনে দোলাচলতা, আত্মরক্ষার তাগিদে জবরদখল কলোনি নির্মাণ, ১৯৫১ সালের উদবাস্তু উচ্ছেদ

আইন, উদ্বাস্তু উচ্ছেদের প্রতিবাদে U.C.R.C.(united central refugee council) ও I.C.R.C.(international committee of red cross)-র ভূমিকা, উদ্বাস্তু আন্দোলনে সমকালীন বামপন্থী সংগঠনগুলির সমর্থন প্রভৃতি বিষয় এখানে উঠে এসেছে। এর পাশাপাশি সমস্তরকম সংকট আর অনিশ্চয়তাকে বুকে নিয়ে উদ্বাস্তুদের নিজেদের জাতিসত্তা ও চিন্তাচেতনাকে টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে মহীকান্ত, নিশিকান্ত, অমূল্য ও রণদের দুই প্রজন্মের এই ইতিহাসে। 'বর্ডার'(২০১০) উপন্যাসের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বসবাসকারী ছিন্নমূল মানুষদের অবিচারের কাহিনীবৃত্ত নিয়ে। এখানে একদিকে ভিটেমাটি হারানোর যন্ত্রণা, অন্যদিকে স্থায়ী পরিচয়পত্র না থাকায় পুনরায় নতুন বাসস্থান থেকে ছিন্নমূল হওয়ার আশঙ্কা—এই দ্বিবিধ বিষণ্ণতাবোধে মগ্ন থেকেছে হিলি বর্ডার সীমান্তের উদ্বাস্তু জনসমাজ। এখানে দেশ, গ্রাম, আত্মপরিচয়হীন রাশেদ—এর রূপকে দাঙ্গা, দেশভাগ ও সীমানাকেন্দ্রিক সমস্যার মতো বিষয়গুলির প্রতি প্রতিবাদ করেছেন ঔপন্যাসিক। সময়ের নিরিখে উপন্যাসের সূত্রপাত ২০০৯ সাল। কিন্তু কাঁটাতারের ধারে থাকা অত্যাচারিত ছিন্নমূল মানুষেদের স্মৃতিকথা আর অতীতদিনের অনুসঙ্গে উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে উদ্বাস্তু মানুষদের জীবন যন্ত্রণা এবং তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ের প্রসঙ্গ। 'পিঞ্জরের পাখিরা'(২০১৫) উপন্যাসের মূল বিষয় ছিটমহল সমস্যা। সীমান্তকেন্দ্রিক জটিলতার কারণে ছিটমহলের জনসমাজের আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও সংকট এখানে এক পিতা-পুত্রের বেদনাঘন সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে সুগভীরভাবে চিত্রিত হয়েছে। ছিটমহলের দেশহীন উদ্বাস্তু জনসমাজের দুরবস্থা আবু হাসান মণ্ডলের অসহায়তায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'লাশ ভাইস্যা যায়'(২০১৮) উপন্যাসে স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও দেশ বিভাগের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে মানবতার এক সংকটময় অধ্যায়কে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। মানবতাবিরোধী দাঙ্গা কীভাবে মানুষের সমস্ত শুভাশুভ বোধকে ছিন্নভিন্ন করে তাকে অমানুষে পরিণত করেছিল, এ উপন্যাস সেই অনুচ্চারিত ইতিহাসের কথা বলে যায়। 'এক পয়সার ট্রাম'(২০১৬) উপন্যাসটির কেন্দ্রে রয়েছে ১৯৫৩ সালের ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলন। ১৯৫৩ সালে ব্রিটিশ কোম্পানির মালিকানাধীন কলকাতা ট্রাম কোম্পানি আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসের টিকিটের ভাড়া ১ পয়সা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলে কলকাতার সমাজতান্ত্রিক ঘরানার দল CPI (কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া) এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে আন্দোলনের ডাক দেয়। দেশভাগের ফলে নিঃস্ব-রিক্ত উদ্বাস্তু জনগণও সামিল হয়েছিল এই প্রতিবাদী আন্দোলনে। উপন্যাসে স্বাধীনতা পরবর্তী পঞ্চাশের দশকের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসের পর্যালোচনায় তাই স্বাভাবিকভাবে গুরুত্ব পেয়েছে দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবনের বিভিন্ন দিকগুলি।

পঞ্চম অধ্যায়
শচীন দাশের উপন্যাসের ভাষাশৈলী

পঞ্চম অধ্যায়ে শচীন দাশের উপন্যাসসমূহের ভাষাশৈলীকেন্দ্রিক আলোচনা স্থান পেয়েছে। সাহিত্যরচনায় স্রষ্টা সর্বদাই নিজের প্রয়োজন মতো শব্দ, বাক্য নির্বাচনে গড়ে তোলেন তাঁর সৃষ্টি। সেখানে শব্দ প্রয়োগের কৌশল হোক কিংবা বাক্য নির্মাণের দক্ষতা—সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে আসলে স্রষ্টার স্বাতন্ত্র্যের ছাপ প্রতিফলিত হয়। উপন্যাস রচনাতেও ঔপন্যাসিক তাঁর স্থিরকৃত কথা (narrative) ও কথনের (narration) প্রয়োগ করেন। ঘটনার সঙ্গে ঘটনার দ্বন্দ্বে, কখনো বা ঘটনা ও চরিত্রের সাযুজ্যে, কখনো আবার plot-এর পরিবর্তে ঘটনার পরোক্ষ প্রতিক্রিয়ায় গড়ে তোলেন উপন্যাস দেহ।[২০] আখ্যানে চরিত্রদের প্রত্যক্ষ উক্তি ও লেখকের পরোক্ষ উক্তিতে প্রকাশ পায় ভাষা ও চেতনার দ্বিবাচনিকতা।[২১] ফলে উপন্যাসের ভাষাশৈলীর আলোচনায় লেখক বা ঔপন্যাসিক কৃত বর্ণনার ভাষা এবং উপন্যাসের চরিত্রসমূহের সংলাপের ভাষার বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ন হয়ে ওঠে।[২২] সুতরাং শচীন দাশের উপন্যাসের ভাষাশৈলীর আলোচনায় বর্ণনার ভাষা ও সংলাপের ভাষা—এই দুটি বিষয়কে দুটি পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। বর্ণনার ভাষার আলোচনায় উপন্যাসের কথনরীতি, চরিত্রসমূহের অনুভূতি, কথকের জীবনদর্শনকেন্দ্রিক বর্ণনা, স্থান-কাল, প্রকৃতি ও পরিবেশের বর্ণনা, চিত্রকল্প ও অলংকারের ব্যবহার প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলি বিশ্লেষিত হয়েছে। অন্যদিকে সংলাপের ভাষার আলোচনায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের চরিত্রসমূহের সংলাপ ও সেই সংলাপে ব্যবহৃত ভাষার বিশেষত্বের দিকগুলি উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্ণনার ভাষা

কথনরীতি - শচীন দাশের উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসেই ভুমিকানুগ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। এই রীতির ব্যবহারে তিনি একদিকে যেমন আত্মকথন রীতির সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছেন, তেমনি সর্বজ্ঞকথন রীতির যান্ত্রিকতাকেও অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই ভূমিকানুগ পদ্ধতিই তাঁর উপন্যাসগুলির প্রধান কথনরীতি হয়ে উঠেছে। অমিতাভ দাসের মতে, এই পদ্ধতিতে নিরীক্ষক কখনও কথক হিসাবে বহিঃপ্রেক্ষিত রচনা করে, আবার কখনও বা চরিত্রের সাপেক্ষে গড়ে তোলে অন্তঃপ্রেক্ষিত।[২৩] উদাহরণস্বরূপ ‘উদ্বাস্তু নগরীর চাঁদ’ উপন্যাসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে—

‘উদ্বাস্তু নগরীর চাঁদ’ : ভূমিকানুগ কথন

নিরীক্ষক : কথক; বহিঃপ্রেক্ষিত

- প্ল্যাটফর্মে মাঝামাঝি গিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল সুধাকান্ত। ঠিক সামনেই একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে। কৃষ্ণনগরের গাড়ি। এখনো ইঞ্জিন লাগেনি। লাগতে লাগতে আরো পাঁচ মিনিট। আরো দশ মিনিট বাদে ট্রেনটা ছাড়ার কথা। এদিক-ওদিকে তাকাতে তাকাতে প্রায় ফাঁকা দেখে একটা কামরাতে উঠে বসলো সে।[২৪]

নিরীক্ষক : নিশিকান্তের পুত্র রণ; অন্তঃপ্রেক্ষিত

- আস্তে আস্তে উঠে বসলো রণ। চারপাশে আবার তাকাতে লাগল। সেই সঙ্গে একটা কৌতূহল। এ কেমন বাড়ি! জানলা নেই, দরজার কপাট নেই। মাথায় টিনের চালা নেই। শুধু সামনে একটা ঝাঁপ। কী জানি, কেন যে আগের ওই সুন্দর বাড়ি ছেড়ে এমন বিচ্ছিরি একটা বাড়িতে উঠে এলো তারা। অবশ্য আগের বাড়িটায় আগুন লেগেছিল। দেখতে দেখতে অত বড় বাড়িটা সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই। বাবা জেঠারা চেষ্টা করেও নেভাতে পারিনি সে আগুন। এমনকি ঘরে জিনিসপত্র কিছু বের করতে পারেনি। শুধু কি ওদের, সে রাতে আরো অনেকের বাড়িতেও লেগেছিল আগুন। পাড়ার পর পাড়া পুড়ে গেছে। বাচ্চুদা বলেছে, আগুন নাকি লাগিয়েছে নুরুদ্দিনের বাপ-চাচারা।[২৫]

ব্যাখ্যা : 'উদ্বাস্তু নগরীর চাঁদ' উপন্যাসে অন্তঃ ও বহিঃপ্রেক্ষিত—উভয়ই প্রতিফলিত হয়েছে। এই উপন্যাসের প্রথম উদাহরণে কথক কাহিনীর বাইরে থেকে প্রথম পুরুষেই তার বক্তব্যকে তুলে ধরেছে। কাহিনীতলে প্রবেশ করে চরিত্র-অনুযায়ী কথা বলে নি। কিন্তু পরের উদাহরণে কথক 'রণ' নামক ছোট্ট ছেলেটির বর্ণনা দিতে দিতে তারই স্বর বা ভূমিকা অনুযায়ী ঘটনার বিবরণ দিতে শুরু করে। সুতরাং কাহিনীতলের চরিত্র অনুযায়ী বাচন এবং অন্তঃপ্রেক্ষিত ও বহিঃপ্রেক্ষিতের সম্মিলিত ব্যবহারের ফলে এটি ভূমিকানুগ কথন হয়েছে।

অনুভূতি, স্থান, কাল, প্রকৃতি ও পরিবেশের বর্ণনা

- হাঁটতে হাঁটতে একসময় দুজনেই ওরা নিরুত্তর। কথা যেন হারিয়ে যায়। একটি পরে রাস্তাটা যেখানে দুভাগ হয়ে কলোনির দুদিকে চলে গেছে সেখানে এসেই বকুলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় অমূল্য।[২৬] **(বিচ্ছেদ-বেদনা)**

ব্যাখ্যা : অমূল্য ও বকুল ছিন্নমূল পরিবারের দুই তরুণ তরুণী একে ওপরকে ভালোবেসেও পরিবারের মত না থাকায় এক হতে পারে না। ফলে তাদের মনের যন্ত্রণা ও হাহাকার যেন অনেক বেশি পরিব্যপ্ত হয় তাদের কথা হারানোর শব্দবন্ধে। এই জীবনে তাদের পথ আর কখনো এক হবে না। তাই কলোনির দুদিকে উভয়ের রাস্তা আলাদা হয়ে যাওয়ার বর্ণনাতেও স্বতন্ত্র এক ব্যঞ্জনা প্রতিধ্বনিত হয়। এই ধরণের প্রতীকী শব্দবন্ধের ব্যবহার, স্বতন্ত্র বর্ণনাশৈলী শচীন দাশের একান্তই নিজের।

- জেলেপাড়া এখন ছাদছিরিহীন। মাকালের থানে নোনা জাগে।[২৭]

ব্যাখ্যা : এই বর্ণনায় 'ছাদছিরিহীন' শব্দ জেলে পাড়ার আর্থ-সামাজিক দুরবস্থা বা দৈন্যদশাকে চিহ্নিত করেছে। আদিগঙ্গার জলস্রোত ক্ষীণ হয়ে আসায় নদীতীরবর্তী কৈবর্ত সমাজ তাদের জীবন-জীবিকার আশ্রয় হারিয়ে হয়ে পড়ে নিঃস্ব। 'ছাদছিরিহীন' শব্দের ব্যঞ্জনায় জেলেদের আশ্রয়হীনতার প্রসঙ্গ প্রতিকায়িত হয়েছে। অন্যদিকে দেবতার উপাসনা স্থল 'নোনা ধরা' অর্থাৎ অযত্ন অবহেলায় পড়ে থাকার রূপকল্পে স্থানীয় জনসমাজের বৃত্তিবদল ও গ্রাম পরিত্যাগের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে।

- গঙ্গা তাই এখন রক্তাক্ত। রক্তই ঝরছে। কিন্তু কোন শব্দ নেই। নিঃশব্দে চর ফেলে ফেলে যেন অজান্তেই সে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে কোন অতলে...।[২৮]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য বর্ণনায় মৃতপ্রায় আদিগঙ্গার দুরবস্থাকে তুলে ধরতে নদীকে 'রক্তাক্ত' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'চর ফেলা' 'গুটিয়ে নেওয়া' প্রভৃতি শব্দবন্ধের দ্বারাও এখানে নদীবক্ষে চর পড়ে নদীর মৃত্যুর পরিস্থিতিকে বর্ণনা করা হয়েছে।

অলংকার

- খেতে খেতে গনপতি টের পেয়েছিল খিদেটা, সেই কখন এখানে নেমেই খিদেটা শানানো ছুরির মতো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।[২৯]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য বাক্যাংশে উপমেয় ক্ষুধাকে 'তীক্ষ্ণ ছুরি'র উপমানে উপমিত করা হয়েছে। অর্থাৎ গণপতির ক্ষুধার তাড়নাকে প্রতিকায়িত করতে ঔপন্যাসিক ছুরির তীক্ষ্ণতার প্রসঙ্গকে উত্থাপন করেছেন। ফলে এটি উপমা অলংকারের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

চিত্রকল্প

- যেন কল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জ্বলন্ত এক লণ্ঠনের ফিতেকে আচমকা কমিয়ে দিল কেউ। আর কমাতেই অন্ধকার। হুড়মুড় করে যেন হঠাৎই অন্ধকার নেমে এল চারপাশে।[৩০]

ব্যাখ্যা : এখানে সূর্যাস্তের সঙ্গে আঁধার ঘনিয়ে আসার প্রসঙ্গে জবরদখল কলোনির সর্বহারা মানুষদের আশাহীনতা ও যন্ত্রণাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক। আসলে রাতের আঁধার একদিকে তাদের দুঃস্বপ্নের মুহূর্তগুলোকে সামনে এনে দাঁড় করায়, তেমনি রাতের অন্ধকারেই ভাড়াটে গুণ্ডারা হানা দেয় তাদেরকে কলোনি থেকে উৎখাত করতে। ফলে লণ্ঠনের আলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সূর্যাস্ত এবং হুড়মুড় করে সন্ধে নামার চিত্রকল্পে ছিন্নমূল কলোনির মানুষদের দ্বিবিধ যন্ত্রণা প্রতিকায়িত হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সংলাপের ভাষার আলোচনায় সাংবাদিক, প্রশাসনিক ব্যক্তিদের সংলাপ, ঐতিহাসিক কালের ব্যক্তিদের সংলাপ, আঞ্চলিক উপভাষা, নারীর সংলাপ, টেলিফোনিক সংলাপ প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলি আলোচিত হয়েছে।

উপসংহার

শচীন দাশের জন্ম এবং সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব—এই দুটি কালই বাংলার সমাজ জীবনের পরিবর্তনে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। এই দুই সময়কালের প্রভাব তাঁর ব্যক্তি তথা সাহিত্যজীবনকেও প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। তাঁর সাহিত্যরচনার বাঁকবদল ও গতিপ্রকৃতির নির্ধারণেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে সময় বা কাল। তাঁর উপন্যাস সাহিত্যের বিষয়চিন্তার অন্বেষণে আমরা মূলত তিনটি প্রধান বিষয়কে চিহ্নিত করে তার বিশ্লেষণে উদ্যোগী হয়েছিলাম। প্রথমত, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন, দ্বিতীয়ত, সুন্দরবনকেন্দ্রিক জনসমাজ এবং তৃতীয়ত নদীকেন্দ্রিক সমাজজীবন। সেক্ষেত্রে সমকাল ও ব্যক্তিজীবনের আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা তাঁর দেশভাগকেন্দ্রিক উপন্যাস রচনার তাগিদকে চিহ্নিত করেছি। সেখানে উঠে এসেছে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিজীবনে দাঙ্গা ও দেশভাগের প্রভাব, উদ্বাস্তু কলোনির জীবনঅভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ, উদ্বাস্তু আন্দোলন ও ছিন্নমূল জীবনযন্ত্রণার ইতিবৃত্ত প্রভৃতি। ফলে তাঁর ‘উদ্বাস্তু নগরীর চাঁদ’, ‘মানচিত্র বদলে যায়’, ‘লাশ ভাইস্যা যায়’ কিংবা ‘বর্ডার’-এর মতো উপন্যাসগুলি নিছক দেশভাগের উপন্যাস হয়ে থাকেনি। সেখানে ঔপন্যাসিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও দেশকাল চেতনা সমস্বরে প্রতিকায়িত করেছে ছিন্নমূল জনজীবনের নির্মম ও গভীর জীবনসত্যকে।

অন্যদিকে তাঁর সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাসের আলোচনাতে আমরা দেখলাম যে জল-জঙ্গলের প্রতিকূলতায় সুন্দরবনের অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর মাটিসম্পৃক্ত জীবনকথা সমকালের প্রভাবান্বিত ফসল রূপেই তাঁর উপন্যাসে স্থান করে নিয়েছে। বাংলা কথাসাহিত্যের অঙ্গনে শচীন দাশের আবির্ভাব ঘটেছিল সত্তর দশকের শেষ দিকে। সত্তর আশির দশকের নব্য লেখকগোষ্ঠী তখন অঞ্চলভিত্তিক গ্রামজীবনের প্রেক্ষিতে সমাজব্যবস্থার স্বরূপ উন্মোচনে নিমগ্ন। এই নব্য লেখকগোষ্ঠীর তরুণ সদস্য শচীন দাশও কর্মসূত্রের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে একটি স্বতন্ত্র গ্রামীণ অঞ্চল রূপে বেছে নিয়েছিলেন সুন্দরবনকে। ফলে তাঁর সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাসে জমির অধিকারকে কেন্দ্র করে সেখানকার জোতদার-ভাগচাষীদের দ্বন্দ্বের ইতিবৃত্তে প্রকাশ পেল ইতিহাসচেতনা। পাশাপাশি বিশ্বায়ন ও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রভাবে সুন্দরবনের গ্রামজীবনের পরিবর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা, গ্রামীণ রাজনীতির জটিলতা ও দুর্নীতির প্রসঙ্গ, মিথ-রূপকথা-ম্যাজিক রিয়ালিজম প্রভৃতি তত্ত্ব ও লোককথার প্রয়োগে সুন্দরবনের লোকায়ত জীবনভাবনার অনুষঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের জনজীবনের মৌলিক সমস্যা ও সংকট যেন মূর্ত করে উঠল।

নদীপ্রকৃতি ও নদীঅন্বিত সমাজ জীবনের চিত্রায়নে শচীন দাশ পরিবেশবাদী সমাজতাত্ত্বিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। লেখক নিজে ছিলেন উদ্বাস্তু পরিবারের মানুষ। এক শ্রেণির রাজনৈতিক শাসকদের চক্রান্তে ছিন্নমূল হয়েছিলেন তাঁরা। একইরকম ভাবে

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় এক শ্রেণির অর্থলোলুপ স্বার্থান্বেষীদের প্রকৃতি-বিমুখ নদীপরিকল্পনায় বহু নদী আজ হয়ে উঠেছে মৃতপ্রায়। ঔপন্যাসিকের মনে হয়েছে মৃতপ্রায় ও মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নদীগুলিও যেন তাঁর মতোই ছিন্নমূল—

> আমি নিজে যেমন একজন ছিন্নমূল মানুষ, যৌবনে কাজে ও অকাজে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাদা ও লাট অঞ্চলের, বিশেষত সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে গিয়েই লক্ষ করেছি আমার মতো নদীও একজন ছিন্নমূল। সভ্যতা ও উন্নয়নের ফলে উচ্ছেদের শিকার। এ কথা কেবল সুন্দরবনের নদীই নয়, নদীমাতৃক আমাদের দেশের সব নদী-নালা সম্পর্কেই বলা যায়। কাজেই নদী সম্পর্কে আমার উৎসাহ বাড়ল। তাছাড়া নদী-নালার দেশ থেকেই তো এসেছি একদিন এখানে, ফলে নদী যে আমায় টানবে তাতে আর আশ্চর্য কী![৩১]

নদীকেন্দ্রিক এই জীবনবীক্ষাই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিতে। প্রযুক্তির শক্তিতে নদীপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে পরোক্ষে ক্ষতিসাধন হয়েছে নদীর জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্রের। বিনষ্ট হয়েছে পরিবেশের ভারসাম্য। নদীপ্রকৃতির সেই ভারসাম্যহীনতার স্বরূপকে লেখক তুলে ধরলেন 'অন্ধ নদীর উপাখ্যানে'। দেখা গেল ছিন্নমূল নদীর প্রবাহ পরিবর্তনের ফলে নদীকেন্দ্রিক জনসমাজের ভয়াবহ পরিণতি। নদীর মজে যাওয়া ও তার উচ্ছেদের প্রেক্ষাপটে জনসমাজের ছিন্নমূল হওয়ার চিরকালীন আখ্যান হয়ে উঠল 'নদী তরঙ্গের আয়না'। সেখানে মঙ্গলকাব্যের ধনপতি ও বর্তমানের ধনপতির নদী সন্ধানের অনুষঙ্গে নদীপরিকল্পনা ও নদী সংরক্ষণের মতো বিষয়গুলি শৈল্পিক তাৎপর্যে আত্মপ্রকাশ করল। নদীদূষণ, সমুদ্রের জলস্তর বেড়ে যাওয়ার ফলে নদীভাঙন ও বন্যায় বিপর্যস্ত পরিবেশ উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে 'আকালুদ্দি ও এক নদী' উপন্যাসে। সেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে প্রকৃতিপ্রেম ও অস্তিত্ব রক্ষার দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে নদীসম্পৃক্ত মানুষ আকালুদ্দি। আবার ক্ষমতাধর পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শোষণ ও নিপীড়নের প্রেক্ষিতে 'জল জঙ্গলের রয়ানি', 'আকালুদ্দি ও এক নদী' প্রভৃতি উপন্যাসে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে নদী ও নারীর জীবনযন্ত্রণা। এইভাবে পরিবেশকেন্দ্রিক সচেতনতাবোধের বহিঃপ্রকাশে উজ্জ্বল হয়ে ঘটেছে তাঁর নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি।

সুদীর্ঘ চারটি দশক ধরে লিখতে গিয়ে শচীন দাশ কখনও তাঁর জীবনাদর্শ থেকে লক্ষ্যচ্যুত হন নি। জনপ্রিয়তা লাভের লোভে মেধা-মনন, সত্যনিষ্ঠাকে পরিত্যাগ করে বিনোদন সর্বস্ব সাহিত্য রচনার স্রোতে গা ভাসান নি। সাহিত্যের প্রতি তাঁর এই নিষ্ঠাকে লক্ষ করেই কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় তাঁকে নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ বলে উল্লেখ করেছিলেন।[৩২] সাহিত্যজগতে জনপ্রিয়তার শিখরে থাকার মুহূর্তে শুধুমাত্র পারিবারিক পরিজনদের দুঃসময়ে

তাদের পাশে থাকতে অবলীলায় পরিত্যাগ করেছিলেন সাহিত্যজগত। এই সততা ও আত্মত্যাগের আদর্শই পুনরায় তাঁকে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে। পরে আবার শূন্য থেকে শুরু করে কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্য জগতে তাঁর স্বতন্ত্র পরিচিত গড়ে তোলেন। এই কারণে তাঁর সাহিত্য জীবনের দুটি পর্বান্তর লক্ষ করা যায়। প্রথমদিকে তাঁর রচনায় নগরজীবন, কিছু পরে সুন্দরবন ও প্রান্তিক জনজীবন প্রাধান্য পেতে দেখি। পরবর্তী পর্বে নয়ের দশক থেকে তাঁর রচনায় প্রকাশ পেতে থাকে দেশভাগ ও নদীকেন্দ্রিক সমাজ জীবন। সেখানে মিথ, পুরান, লোককথার পাশাপাশি পরাবাস্তবতা, ম্যাজিক রিয়ালিজমের মতো তত্ত্বভাবনার ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাঁর সৃষ্ট উপন্যাস সাহিত্যে পারিপার্শ্বিক শহুরে মধ্যবিত্ত জীবন মাঝে মধ্যে উঁকিঝুকি দিলেও প্রান্তিক ও নিম্নবিত্ত জনসমাজই হয়ে উঠেছে প্রধান অবলম্বন। অন্ত্যজ সমাজের জীবন-যন্ত্রণা ও অসহায়তার প্রকাশে তিনি যেমন সৎ থেকেছেন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সমাজের প্রতিও ঠিক যেমন প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নিষ্ঠা ও দায়বদ্ধতা, তেমনি দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবনের বর্ণনাতেও প্রায়ই স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর।

পরিশিষ্ট

'পরিশিষ্ট' অংশের চারটি পর্ব। প্রথম পর্বে রয়েছে সাহিত্যিক শচীন দাশের সহধর্মিণী শ্রীমতী উমা দাশের সাক্ষাৎকার। দ্বিতীয় পর্বে শচীন দাশের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি, তৃতীয় পর্বে শচীন দাশের সাহিত্যকর্মের একটি রচনাপঞ্জি এবং চতুর্থ পর্ব 'চিত্রপঞ্জি'তে তুলে ধরা হয়েছে তাঁর ব্যক্তি ও সাহিত্যজীবনের উল্লেখযোগ্য কিছু বিশেষ মুহূর্তকে।

টিকা ও সূত্রনির্দেশ

১. পরীক্ষিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, "শতবর্ষের আঙিনায় বাংলা ছোটগল্প : একটি সমীক্ষা", 'বিষয় বাংলা গল্প', কলকাতা, 'সুপ্রকাশনী', ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫, পৃ ৪৪

২. মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, "বাংলা উপন্যাসে গোষ্ঠীচেতনা", 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', মাঘ-চৈত্র ১৪১৩ (জানুয়ারি-মার্চ ২০০৭), তৃতীয় সংখ্যা, পৃ ৬২

৩. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, "বাংলার ছোটগল্প : বিবর্তনের নানাপথ", 'কোরক' (আধুনিক ছোটগল্প সংখ্যা), সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর, শারদীয় ১৯৯৫, পৃ ৭৪-৭৫

৪. অনিন্দিতা ঘোষাল, "অস্তিত্বহীনতা থেকে আন্দোলনের পথে : বাংলার উদ্বাস্তুজীবনের কয়েক টুকরো ছবি", 'বঙ্গবিদ্যা' (খণ্ড ২-৩), ২০১১-২০১২, পৃ ২০১৮

৫. শ্রী হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উদ্বাস্তু', কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, আগস্ট ১৯৬০, পৃ ৩৬

৬. প্রসূন ঘোষ, "মঙ্গলকাব্য ও বাংলা উপন্যাস", 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', (সম্পা) অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, মাঘ-চৈত্র ১৪১৩ (জানুয়ারি মার্চ, ২০০৭) তৃতীয় সংখ্যা, পৃ ৪৫

৭. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২০, পৃ ৭২

৮. ড. অতুল সুর, বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন, সাহিত্যলোক, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১২, পৃ ৩৯

৯. ইন্দ্রাণী ঘোষাল, বাংলা নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস, গ্রথন প্রকাশনী, দক্ষিণ গড়িয়া, মার্চ ২০০৪, কথামুখ পৃ ৭

১০. অরুণকুমার বসু, এক অন্ধ নদীর উপাখ্যানকে নিয়ে কয়েকটি কথা, সমকালের জিয়নকাঠি: শচীন দাশ স্মরণ সংখ্যা, সম্পাদক-নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, জানুয়ারি-জুন সংখ্যা, ২০১৬, পৃ ৪৮২।

১১. Dampier ছিলেন একজন কালেক্টর এবং Hodge ছিলেন সার্ভেয়ার। ১৮২৮ সাল থেকে ১৮৩২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ বছর তাঁদের তত্ত্বাবধানে জরিপ করার পর সুন্দরবনের প্রকৃত এলাকা বা সীমানা নির্দিষ্ট হয়।

দ্রষ্টব্য: পীযূষকান্তি মণ্ডল, "ভূমিব্যবস্থা ও সুন্দরবন", 'সমারূঢ় ব্যতিক্রম' (বিশেষ অন্বেষণ-সুন্দরবন), প্রথম বর্ষ ; শারদ সংখ্যা, ১৩৯৮, পৃ ৪৭

১২. নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (আদি পর্ব), অষ্টম সংস্করণ, কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, বৈশাখ ১৪২০, পৃ ৮৫

১৩. ডাঃ সুশীল ভট্টাচার্য, "ঐতিহাসিক কালে সুন্দরবন", 'সমারূঢ় ব্যতিক্রম' (বিশেষ অন্বেষণ -সুন্দরবন), পূর্বোক্ত, পৃ ২৬

১৪. এ.এফ.এম. আব্দুল জলিল, 'সুন্দরবনের ইতিহাস', কলকাতা, নয়া উদ্যোগ, ২০০০, পৃ ১৩

১৫. সুমিতা চক্রবর্তী, "শচীন দাশের গল্প", 'দিবারাত্রির কাব্য', দ্বাদশ বর্ষ ; তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, পৃ ৮৪

১৬. শচীন দাশ, "স্বপ্নের মতো উঠে এলো সুন্দরবনের মানুষেরা", 'সমকালের জিয়নকাঠি : শচীন দাশ স্মরণ সংখ্যা', জানুয়ারি-জুন সংখ্যা ; ২০১৬, পৃ ১৮১

১৭. 'Sir Andrew fraser has throughout taken a personal interest in this scheme. It owes its inception to him; and he has exercised a close supervision over its development. Fraserganj may, indeed, be said to owe its creation to him and it was felt to be only fitting that the place should bear his name. For the island was formerly a barren waste known by fisherman as Narayontola—a name so common that the post office authorities, to prevent confusion, asked that it should

be changed; and his honour acceded to the request that the place should be called after him.'

The Administration of Bengal Under Sir Andrew Fraser-1903-1908, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1908, P. 202

১৮. সিরাজুল ইসলাম, "রাজনৈতিক ইতিহাসের পেক্ষাপট", 'বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)', (সম্পা) সিরাজুল ইসলাম, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃ ২৩

১৯. সন্দীপ বন্দোপাধ্যায়, 'ইতিহাসের দিকে ফিরে ছেচলিশের দাঙ্গা', কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল, ২০০০, পৃষ্ঠা ২১

২০. অনিন্দ্য ভট্টাচার্য, 'কথনতত্ত্ব ও বাংলা উপন্যাস', কলকাতা, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ ৭৬

২১. তপোধীর ভট্টাচার্য, 'বাখতিন', কলকাতা, এবং মুশায়েরা, আগস্ট ২০০৯, পৃ ৩৭

২২. ড. মফিজ উদ্দিন, 'শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস : ভাষা ও শৈলী', কলকাতা, একুশ শতক, জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা ৩১

২৩. অমিতাভ দাস, 'আখ্যানতত্ত্ব', কলকাতা, ইন্দাস, নভেম্বর ২০১০, পৃ ৭৬

২৪. শচীন দাশ, 'উদ্বাস্তু নগরের চাঁদ', কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০০৮, পৃ ১০৮

২৫. তদেব, পৃ ৩৬

২৬. ঐ, 'মানচিত্র বদলে যায়', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ ২০২

২৭. ঐ, 'অন্ধ নদীর উপাখ্যান', কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ ১৯১

২৮. ঐ, 'অন্ধ নদীর উপাখ্যান', পূর্বোক্ত, পৃ ১৯২

২৯. ঐ, নুন দরিয়া, কলকাতা,২০১১বইমেলা ,করুণা প্রকাশনী , পৃষ্ঠা ২১

৩০. ঐ, 'মানচিত্র বদলে যায়', পূর্বোক্ত, পৃ ৩৩২

৩১. শচীন দাশ, "আমি কবিতা লিখি না, আবার লিখিও", 'সমকালের জিয়নকাঠি : শচীন দাশ স্মরণ সংখ্যা', জানুয়ারি-জুন ২০১৬, পৃ ৮৩

৩২. পবিত্র মুখোপাধ্যায়, "সম্পাদকের কথা", 'কবিপত্র প্রকাশ', ৪৫ বর্ষ, শরৎ-বসন্ত সংখ্যা, অক্টোবর-মার্চ, ২০০১-০২

গ্রন্থপঞ্জি

ক. আকর গ্রন্থ

১. শচীন দাশ। 'জীবনের একদিক'। কলকাতা, শারদীয়া অমৃত, ১৩৮৫।

২. শচীন দাশ। 'বাঘের চোখ'। কলকাতা, শারদীয়া যুগান্তর, ১৩৮৭।

৩. শচীন দাশ। 'যুদ্ধ সংকেত'। কলকাতা, প্রমা প্রকাশনী, জানুয়ারি ১৯৮৮।

৪. শচীন দাশ। 'আগুনের দিন'। কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ডিসেম্বর ১৯৯৭।

৫. শচীন দাশ। 'দুই জীবনের গল্প'। কলকাতা, দীপ প্রকাশন, জানুয়ারি ২০০০।

৬. শচীন দাশ। 'অন্ধ নদীর উপাখ্যান'। কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০০৪।

৭. শচীন দাশ। 'উদ্বাস্তু নগরীর চাঁদ'। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০০৮।

৮. শচীন দাশ। 'নুন সাগরের মানুষজন'। কলকাতা, পাল পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০০৮।

৯. শচীন দাশ। 'নদী তরঙ্গের আয়না'। কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, বইমেলা ২০০৯।

১০. শচীন দাশ। 'বর্ডার'। কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, বইমেলা ২০১০।

১১. শচীন দাশ। 'নুন দরিয়া'। কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, বইমেলা ২০১১।

১২. শচীন দাশ। 'জল জঙ্গলের রয়ানি'। কলকাতা, একুশ শতক, বইমেলা ২০১৩।

১৩. শচীন দাশ। 'লাশ ভাইস্যা যায়'। কলকাতা, কৃতি, জানুয়ারি ২০১৪।

১৪. শচীন দাশ। 'মানচিত্র বদলে যায়'। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৪।

১৫. শচীন দাশ। 'আকালুদ্দি ও এক নদী'। ঢাকা, নান্দনিক, একুশে বইমেলা ২০১৪।

১৬. শচীন দাশ। 'পিঞ্জরের পাখিরা'। কলকাতা, নবকল্লোল, পৌষ ১৪২২।

১৭. শচীন দাশ। 'এক পয়সার ট্রাম'। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১৬।

১৮. শচীন দাশ। 'বৃষ্টির শব্দ'। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, সমকালের জিয়নকাঠি পত্রিকা, জুন ২০১৬।

১৯. শচীন দাশ। 'তিস্তার কাছাকাছি'। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, ২০২৪।

খ. সহায়ক বাংলা গ্রন্থ

১. অচিন্ত্য বিশ্বাস। 'প্রসঙ্গ অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম'। তৃতীয় সংস্করণ। কলকাতা, রত্নাবলী, ডিসেম্বর ২০০৫।

২. অতুল সুর। 'বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন'। চতুর্থ সং। কলকাতা, সাহিত্যলোক, ২০১২।

৩. অনিন্দ্য ভট্টাচার্য। 'কথনতত্ত্ব ও বাংলা উপন্যাস'। কলকাতা, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, ২০১১।

৪. অনিল আচার্য (সম্পা.)। 'সত্তর দশক'। অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১৪। দ্বিতীয় খণ্ড।

৫. অমলেন্দু সেনগুপ্ত। 'উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব'। প্রথম প্রতিভাস সংস্করণ। কলকাতা, প্রতিভাস, ২০০৬।
৬. অমলেন্দু দে। 'প্রসঙ্গ অনুপ্রবেশ'। কলকাতা, বর্ণপরিচয়, ১৯৯৪।
৭. অমলেশ ত্রিপাঠী। 'স্বাধীনতার মুখ'। কলকাতা, আনন্দ, ২০০৮।
৮. অমিতাভ দাস। 'আখ্যানতত্ত্ব'। কলকাতা, ইন্দাস, ২০১০।
৯. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। 'কালের প্রতিমা'। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯১।
১০. অরূপকুমার দাস। 'ষাট সত্তরের দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্য'। কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০১২।
১১. অমর ভট্টাচার্য। 'লাল তমসুক : নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রামাণ্য তথ্য সংকলন'। কলকাতা, গাঙচিল, মার্চ ২০১৯।
১২. অশ্রুকুমার শিকদার। 'ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য'। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা, দে'জ, ২০১১।
১৩. আশরাফ সিদ্দিকী। 'লোকসাহিত্য'। দ্বিতীয় সংস্করণ। ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৮০।
১৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য। 'বাংলার লোকসংস্কৃতি'। দিল্লী, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, ২০১০।
১৫. ইন্দ্রাণী ঘোষাল। 'বাংলার নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস'। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, গ্রথন, ২০০৪।
১৬. কপিল ভট্টাচার্য। 'বাংলাদেশের নদনদী ও পরিকল্পনা'। বর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ১৯৫৯।
১৭. কমল চৌধুরী। 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত'। কলকাতা, মডেল পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৭।
১৮. কমল চৌধুরী (সম্পা.)। 'বাংলা গণ আন্দোলনের ছয় দশক'। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা, পত্রভারতী, ২০০৯। ১ম খণ্ড।
১৯. কোকা আন্তনোভা, গ্রিগোরি বোন্‌গার্দ-লেভিন ও গ্রিগোরি কতোভস্কি। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'। অনুবাদ-মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও দ্বিজেন শর্মা। তৃতীয় সংস্করণ। মস্কো, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮।
২০. কৃষ্ণকালী মণ্ডল। 'প্রসঙ্গ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার পুরাকথা'। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ২০০২।
২১. গিরীন্দ্রনাথ দাস। 'বাংলা পীর সাহিত্যের কথা'। কলকাতা, শহিদ লাইব্রেরী, ১৯৭৬।
২২. গোপেন্দ্রনাথ বসু। 'বাংলার লৌকিক দেবদেবী'। পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ। কলকাতা, দে'জ, ১৯৭৮।
২৩. গৌতম ভদ্র (সম্পা.)। 'নিম্নবর্গের ইতিহাস'। কলকাতা, প্রতিভাস, ১৯৯৮।

২৪. জোয়াকিম জোসেফ এ. ক্যাম্পোস। 'হিস্টরি অব দ্য পর্তুগিজ ইন বেঙ্গল'। অনুবাদ- শানজিদ অর্ণব। ঢাকা, দিব্য প্রকাশ, ২০১৮। [চতুর্থ মুদ্রণ, আগস্ট ২০২২]
২৫. ডক্টর ওয়াকিল আহমেদ। 'বাংলার লোকসংস্কৃতি'। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৫।
২৬. ড. মফিজ উদ্দিন। 'শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস : ভাষা ও শৈলী'। কলকাতা, একুশ শতক, ২০১৫।
২৭. ড. রণজিৎ কুমার সমাদ্দার। 'সাঁওতাল গণযুদ্ধ ও বাংলা সাহিত্য'। কলকাতা, চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, ১৩৬২।
২৮. ড. স্বপন কুমার মণ্ডল। 'আঠারো ভাটির ইতিকথা'-আবাদ পর্ব। কলকাতা, অনন্যা, ২০২১।
২৯. ডাঃ নীতিশ সেনগুপ্ত। 'ডা. বিধানচন্দ্র রায় : জীবন ও সমকাল'। কলকাতা, দে'জ, ১৯৬০।
৩০. তপোধীর ভট্টাচার্য। 'উপন্যাসের বিনির্মাণ'। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০।
৩১. তপোধীর ভট্টাচার্য। 'বাখতিন'। কলকাতা, এবং মুশায়েরা, ২০০৯।
৩২. তাপস ভৌমিক (সম্পা.)। 'পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষা' (কোরক সংকলন)। কলকাতা, কোরক, ২০০৯।
৩৩. তাপস ভট্টাচার্য। 'বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন'। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৪১১।
৩৪. তুষার ভট্টাচার্য (সঙ্কলিত)। 'অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি'। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা, গুরুচণ্ডালি প্রকাশনা, ২০১৫।
৩৫. দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ভারতের নদ-নদী'। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪।
৩৬. দীনেশ চন্দ্র সিন্‌হা। 'শ্যামাপ্রসাদ, বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ'। কলকাতা, গ্রন্থনিলয়, ১৪০৭।
৩৭. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও রমাকৃষ্ণ মৈত্র। 'পৃথিবীর ইতিহাস'। কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৬৩।
৩৮. দেবব্রত দত্ত। 'বিজয়গড় একটি উদ্বাস্তু উপনিবেশ'। কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, জুন ২০০১, পৃ ৩৬।
৩৯. দেবব্রত নস্কর। 'চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী : পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা'। কলকাতা, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৯৯।
৪০. দেবেশ রায়। 'উপন্যাস নিয়ে'। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩।
৪১. দেবেশ রায়। 'উপন্যাসে নতুন ধরনের খোঁজে'। প্রথম বর্ধিত দেজ সংস্করণ'। কলকাতা, দে'জ, ২০০৬।

৪২. ধনঞ্জয় রায় (সম্পাদিত), 'তেভাগা আন্দোলন'। কলকাতা, কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, ২০০০।
৪৩. ধূর্জটি নস্কর। 'সুন্দরবনের লোকায়ত দর্পণ'। কলকাতা, শ্যামলী পাবলিশার্স, ১৯৯৭।
৪৪. নব্যেন্দু সেন (সম্পা)। 'পাশ্চাত্যে সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য ভাবনা'। কলকাতা, রত্নাবলী, ১৯৬২।
৪৫. নির্মল ঘোষ। 'নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য'। কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৪০১।
৪৬. নীহাররঞ্জন রায়। 'বাঙ্গালীর ইতিহাস'। অষ্টম সংস্করণ। কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ১৪২০। আদি পর্ব।
৪৭. পবিত্র সরকার (ভূমিকা সম্বলিত)। 'ভাষা ভাবনা উনিশ-বিশ শতক'। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৭।
৪৮. পল্লব সেনগুপ্ত। 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ'। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০২।
৪৯. পল্লবকুমার সাধু। 'বাংলা উপন্যাসে মঙ্গলকাব্যের আখ্যান'। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৮।
৫০. প্রফুল্ল চক্রবর্তী। 'প্রান্তিকমানব : পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু জীবনের কথা'। কলকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন, ১৯৯৭।
৫১. প্রবোধ কুমার স্যান্যাল। 'হাসুবানু'। কলকাতা, সাহিত্য সংস্থা, কলকাতা ১৯৮৭।
৫২. বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পা)। 'লোককথার সাতকাহন'। কলকাতা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ২০০০।
৫৩. বাবুলকুমার পাল। 'বরিশাল থেকে দণ্ডকারণ্য'। কলকাতা, গ্রন্থমিত্র, ২০১০।
৫৪. বি. টি. রনদিভে। 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্টদের ভূমিকা'। কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭। [২৪ তম মুদ্রণ]
৫৫. বিনয় ঘোষ (অনুদিত)। 'বাদশাহী আমল'। কলকাতা, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, ৭ই চৈত্র ১৮৭৯ শকাব্দ।
৫৬. বিপান চন্দ্র পাল, অমলেশ ত্রিপাঠী ও বরুণ দে। 'স্বাধীনতা সংগ্রাম'। অনুবাদ-ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়। অনুবাদ সংস্করণ। নয়া দিল্লী, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৭৩।
৫৭. বিপ্লব মাজী (সম্পাদিত)। 'বাংলা উপন্যাস ২০০ বছর'। অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ; জুন, ২০০৬।
৫৮. বিমলেন্দু হালদার। 'দক্ষিণ ২৪ পরগনার কথ্য ভাষা ও লোকসংস্কৃতির উপকরণ'। কলকাতা, চতুর্থ দুনিয়া, ১৯৯৯।

৫৯. ভবতোষ দত্ত। 'দেশ কাল সাহিত্য'। কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০০৬।
৬০. ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। 'দেশবিভাগ ও পশ্চাৎ কাহিনী', কলকাতা, আনন্দ, ২০১৩। [পঞ্চম মুদ্রণ]
৬১. মননকুমার মণ্ডল (সম্পা)। 'পার্টিশন সাহিত্য'। কলকাতা, গাঙচিল, ২০১৪।
৬২. মঞ্জু কুমার মজুমদার। 'বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান' (ষষ্ঠ খণ্ড)। কলকাতা, মনীষা গ্রন্থালয়, সেপ্টেম্বর ২০০০।
৬৩. মমতাজুর রহমান তরফদার। 'ইতিহাস ও ঐতিহাসিক'। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮১।
৬৪. মলয় বসু। 'অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য'। ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, জুন ১৯৭৪।
৬৫. মিঠু দেব। 'বাংলা উপন্যাসে দেশভাগের প্রসঙ্গ'। কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ২০১১।
৬৬. মুজাফফর আহমেদ। 'কৃষক আন্দোলন'। কলকাতা, বর্মণ পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৯।
৬৭. ড. মফিজ উদ্দিন। 'শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস : ভাষা ও শৈলী'। কলকাতা, একুশ শতক, জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা ৩১।
৬৮. রামেশ্বর শ। 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা'। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০৮।
৬৯. রাহুল রায় (সম্পা)। 'পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গ : দেশবদলের স্মৃতি'। কলকাতা, গাঙচিল, ২০১৫।
৭০. রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'স্বাধীনতা উত্তর উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান'। কলকাতা, প্যাপিরাস, ১৯৯৩।
৭১. শচীন দাস। 'জল জঙ্গল ও জনজীবনে সুন্দরবন'। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ডিসেম্বর ১৯৯৯।
৭২. শঙ্কর ঘোষ। 'স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন'। কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, মে ১৯৭৫।
৭৩. শান্তিময় ভট্টাচার্য। 'বাংলার কৃষক সংগ্রাম ও তরণী'। কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০০২।
৭৪. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'। কলকাতা, মর্ডান বুক এজেন্সি, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ। [পুনর্মুদ্রণ ২০১০]
৭৫. শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 'দাঙ্গার ইতিহাস'। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩০০ বঙ্গাব্দ। [তৃতীয় মুদ্রণ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ]

৭৬. সতীশচন্দ্র মিত্র। 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)। প্রথম দে'জ সংস্করণ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০১।
৭৭. সন্দীপ বন্দপাধ্যায়। 'দেশভাগ-দেশত্যাগ'। কলকাতা, অনুষ্টুপ, ১৯৯৪,
৭৮. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ইতিহাসের দিকে ফিরে ছেচল্লিশের দাঙ্গা'। কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল, ২০১০।
৭৯. সঞ্জীব দাস। 'সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস'। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, অক্টোবর ২০১৯।
৮০. সমীরণ দত্ত। 'আবুল বাশারের উপন্যাসে মুসলিম জীবনের অন্তঃসার'। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, জুন ২০১৫।
৮১. সাথী নন্দী। 'কিন্নর রায়ের সাহিত্যজীবন ও সাহিত্যভুবন'। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ডিসেম্বর ২০২০।
৮২. সুকুমার সেন। 'ভারত বিভাগ : স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস'। কলকাতা, ভাষা ও সাহিত্য, ১৯৯৯।
৮৩. সুপ্রকাশ রায়। 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গনতান্ত্রিক সংগ্রাম'। তৃতীয় সংস্করণ। কলকাতা, ডি.এন.বি.এ. ব্রাদার্স, এপ্রিল ১৯৮০।
৮৪. সুমিত সরকার। 'আধুনিক ভারত (১৮৮৫-১৯৪৭)'। কলকাতা, কে.পি. বাগচি এন্ড কোম্পানী, ১৯৬০।
৮৫. সুস্নাত দাশ (সম্পা)। 'তেভাগার গল্প'। কলকাতা, প্রতিভাস, ২০১১। [দ্বিতীয় মুদ্রণ]
৮৬. সেমন্তী ঘোষ। 'দেশভাগ : স্মৃতি আর স্তব্ধতা'। কলকাতা, গাঙচিল, ২০০৮।
৮৭. শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। 'উদ্বাস্তু'। কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, আগস্ট ১৯৬০।

গ. সহায়ক ইংরাজি গ্রন্থ

1. Alexander, Lewis M. World political patterns (Rand McNally geography series). Chicago, Rand McNally & Company, 1963.
2. Ascoli, F.D. Revenue History of the Sundarbans (from 1870 to 1920). The Bengal secretariat book depot, Calcutta, 1921.
3. Bandopadhay, Shekhar. From Plassey To Partition : A History Of Modern India, New Delhi, Orient longman private limited, 2004.

4. Barry, Peter. Beginning theory : An introduction to literary and cultural theory, third edition, UK, Manchester University Press, 2009.
5. Chakrabarti, Prafulla Kumar. The Marginal Man : The Refugees and the Left Political Syndrome in West Bengal. Kalyani, Lumiere Books, 1990.
6. Chakrabarty, Saroj. With Dr. B.C. Roy and other Chief Ministers (A record upto 1962), Fist Edition, Calcutta, Benson's, July 1974.
7. Chatterji, Joya. Bengal Divided : Hindu Communalism And Partition, 1932-1947. first paperback edition, U.K., Cambridge University Press, 2002.
8. Mauch, Christof & Zeller, Thomas. Rivers in History: Perspectives on Waterways in Europe and North America. Pittsburgh-USA, University of Pittsburgh press, 2008.
9. Mukherjee, Radhakamal. The changing face of Bengal : a study in Reverine Economy. Calcutta, University of Calcutta, 1938.

ঘ. সহায়ক পত্র-পত্রিকা

১. 'অতিথি'। অসিত কৃষ্ণ দে (সম্পা.)। প্রসঙ্গ সুন্দরবন, ষষ্ঠ বর্ষ, এপ্রিল-জুন, ১৩৯১।
২. 'অনুষ্টুপ'। অনিল আচার্য (সম্পা.)। প্রাক-শারদ সংখ্যা, ৩৯ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৪১২।
৩. 'অমৃত'। তুষারকান্তি ঘোষ (সম্পা.)। বর্ষ ১৬, সংখ্যা ৩৭, ২১ মাঘ ১৩৮৩, (১৯৭৭)।
৪. 'আরাত্রিক পত্রিকা'। দুর্গাদাস মিদ্যা (সম্পা.)। ক্রোড়পত্র-৩ : নলিনী বেরা সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২০।
৫. 'উজাগর'। উত্তম পুরকাইত (সম্পা.)। পার্টিশন, মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও সাহিত্য সংখ্যা, ত্রয়োদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৪২৩ (২০১৬)।
৬. 'উদার আকাশ'। ফারুক আহমেদ (সম্পা.)। ঈদ-শারদ সংখ্যা, বর্ষ ১৬, সংখ্যা ২, ১৪১৩।
৭. 'কবিপত্র প্রকাশ'। পবিত্র মুখোপাধ্যায় (সম্পা.)। শরৎ-বসন্ত সংখ্যা, ৪৫ বর্ষ, অক্টোবর-মার্চ, ২০০১-০২।
৮. 'কৃশানু পত্রিকা'। দীনেশচন্দ্র সিংহ (সম্পা.)। দ্বাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৮৬।
৯. 'কোরক সাহিত্য পত্রিকা'। তাপস ভৌমিক (সম্পা.)। সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা, মে-আগস্ট, ২০০০।

১০. 'কোরক সাহিত্য পত্রিকা'। তাপস ভৌমিক (সম্পা.)। মহামারী বিশেষ সংখ্যা, শারদ ২০২০।
১১. 'খড়গপুর পেজ ফোর'। মৌসুমী সরদার (সম্পা.)। শারদীয়া সংখ্যা, চতুর্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৪২০ (২০১৩)।
১২. 'দেশ পত্রিকা'। সাগরময় ঘোষ (সম্পা.)। ৪ এপ্রিল, ১৯৮৭।
১৩. 'দিবারাত্রির কাব্য'। আফিফ ফুয়াদ (সম্পা.)। উপন্যাস সংখ্যা-৩, জুলাই-অক্টোবর, ২০০৩।
১৪. 'নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতি পত্র'। বিমলেন্দু হালদার (সম্পা.)। ষষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৪১২, (ডিসেম্বর ২০০৫)।
১৫. 'পরিচয়'। বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য (সম্পা.)। সমালোচনা সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৪২৩।
১৬. 'পশ্চিমবঙ্গ'। দিব্যজ্যোতি মজুমদার (সম্পা.)। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংখ্যা, বর্ষ ৩৩, সংখ্যা ৩২-৩৬, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ।
১৭. 'পশ্চিমবঙ্গ'। দিব্যজ্যোতি মজুমদার (সম্পা.)। তেভাগা সংখ্যা, বর্ষ ৩০, সংখ্যা ৪২-৪৬, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ।
১৮. 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পা.)। তৃতীয় সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৪১৩ (জানুয়ারি-মার্চ, ২০০৭)।
১৯. 'সমকালের জিয়নকাঠি'। নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল (সম্পা.)। শচীন দাশ স্মরণ সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০১৬।

ঙ. সহায়ক দৈনিক পত্রিকা

১. অমিয় দেব। "ক্ষমতার লোভে ধর্ম নিয়ে ছলনা"। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। ১৪ মার্চ ২০২০, শহর সং, পত্রিকা, পুস্তক পরিচয়।
২. রুশতি সেন। "সহজ সরল মানুষ আর প্রকৃতি"। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৫ মে, ২০২১, পত্রিকা।
৩. 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। ১৪ই জুন, ২০১৬। শহর সং, 'দক্ষিণের কড়চা'।
৪. জহর সরকার। "নদী ও দেবী"। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬।
৫. স্বপ্নময় চক্রবর্তী। "ধর্মাযুধ"। 'এই সময়', ৭ জুন, ২০২০, পুস্তকপরিচয় অংশ।

চ. আন্তর্জালিক সহায়তা

- ড. মাম্পি বৈদ্য, "তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'খণ্ড বিখন্ড' : সামাজিক সময়ের অন্তস্বর", 'International Journal Of Humanities and Social Science Studies', Karimganj-Assam, Volume-II, Issue-I, July 2015, p. 34.
  Link: https://oaji.net/articles/2015/1115-1438578126.pdf

- সাক্ষাৎকার : তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাক্ষাৎকার গ্রহণ : অঞ্জন আচার্য, চিন্তাসূত্র ওয়েবম্যাগ, জানুয়ারি ১৬, ২০২১ (অনলাইন সংস্করণ)
  Link: https://www.chintasutra.com/interview/অভিজ্ঞতাই-লেখার-উপকরণ-॥-ত/
- সমীর ঘোষ, 'ভগীরথ মিশ্রের সাক্ষাৎকার', ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭,
  Link: galpersamay.com/2017/09/25/ভগীরথ-মিশ্রর-লেখালিখি/